সংগ্রামের বিষয়ে ধারণা লাভ করে এবং উপনিবেশ বিরোধী; বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনের পরিচালনা পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

ভারতীয় দলের রাজনৈতিক অনুষ্ঠান, ইসতেহার এবং কার্যক্রম ওরা মনোযোগ এবং উৎসাহের সঙ্গে পড়েন। এইসব দলিয় এবং অন্যান্য তথ্যগুলি ওদের রাজনৈতিক দলের পরিকাঠামো গঠনে সাহায্য করে।

আফ্রিকার সাধুবাদ ঃ

ঘানার নেতা কাওয়ামে নকরুমা (Kwame Nkurmah) ভারতের প্রেরণাদায়ী ভূমিকার প্রশংসা করে লেখেন "বহুদিন্ ধরে গান্ধীর নীতি নির্দেশ অধ্যয়ন এবং তাঁর কার্যকারিতা লক্ষ্য করে আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনের সমর্থন পুষ্ট হলে এই পথেই উপনিবেশিকতা সমস্যার সমাধান আসতে পারে।" অন্য এক উপলক্ষে উনি বলেছেন, "নেহেরুর অ্যাফ্রো-এশিয় সমস্যা বোঝার দৃষ্টিভঙ্গীও আমাদের অনুপ্রেরিত করেছে। আমরা যারা আফ্রিকার মুক্তিযুদ্ধে একাত্মভাবে যুক্ত ছিলাম।

আফ্রিকার স্বার্থে ভারতের সাহায্যদান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রশংসিত হয়েছে। উপনিবেশবাদ বিরোধী এবং বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলন তীব্র করে তুলতে ভারতের সমর্থন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। দক্ষিণ আফ্রিকার নেত্রী উইনি ম্যান্ডেলা, আফ্রিকা জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার স্ত্রী জোরালো অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, "ভারতীয় জনগণের ঐকমত্য, ঐকান্তিক ভালবাসা এবং সহমর্মিতা আমাদের সাহস এবং প্রেরণা জুগিয়েছে — দুর্বহ বর্ণবৈষম্য এবং অমানবিক রাজশাসনের বিরুদ্ধে মাথা সোজা করে আন্দোলন চালিয়ে যেতে।

স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি ঃ

ভারতীয় উদাহরণ এশিয় এবং আফ্রিকার দেশগুলিকে জোট নিরপেক্ষতার পথ অনুসরণ করতে সাহায্য করেছিল। নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে এই পথ অনুসরণ করার দুটি কারণ ছিল —

(১) ওরা ওদের পূর্বতন ঔপনিবেশিক শাসকদের বিশ্বাস করতেন না। ওরা চিন্তিত ছিল যে, পূর্বতন শাসকেরা পুনরায় রাজনৈতিক এবং সামরিক কর্তৃত্ব ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। ভারতের মতো তারা উপনিবেশকারীদের সাথে কোন সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায়নি।

(২) যেহেতু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্বন্ধে ওদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এবং ওয়ারশ চক্তিভুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের পথ ওদের জন্য খোলা ছিল না সেইহেতু এরা জোট নিরপেক্ষ থাকারই সিদ্ধান্ত নিল। এ ভাবে জোট নিরপেক্ষ নীতি ওদের স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির রাস্তা দেখাল।

৩১.৪ ঔপনিবেশিকতা এবং তার অবশিষ্টাংশ

একদিকে যেমন বহু সংখ্যক সামরিক ঘাঁটি নিয়ে পশ্চিমী শক্তিগুলি তাদের পূর্বতন উপনিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ করছিল তেমনই কিছু রাজ্য (প্রায় ২০টি) তখনও সরাসরি উপনিবেশিক শক্তি দ্বারা শাসিত হত। উপনিবেশের কঠোর সংজ্ঞা অনুযায়ী উপনিবেশ না হলেও প্রথাসিদ্ধ অর্থে আরও চারটি এলাকাও মুক্তিলাভ করেছে অতি সম্প্রতি। উপনিবেশিক শক্তি এই কটি এলাকাতে এমন জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছিল যে, এলাকাগুলির নিয়ন্ত্রণ

ক্ষমতা তখনও তাদের মিত্রশক্তি এবং বিদেশাগত বসবাসকারীদের হাতে ছিল। এই ক্ষেত্রে যদিও নিয়মানুসারে দক্ষিণ আফ্রিকা অনেক দিনই স্বাধীন তবুও সংখ্যালঘু শ্বেত অধিবাসীদের চাপে নামিবিয়া এই সেদিনও দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিবিদ্বেষী ক্ষমতার অধীনে ছিল।

পশ্চিম সাহারা এখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, কারণ স্পেন যাবার আগে মরোক্কো, মাউরিটানিয়াকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেছিল। যতদিন ইংরেজ মরিশাসকে স্বাধীনতা দান করেনি ততদিন একটি দ্বীপ দিয়াগো গার্শিয়া মরিশাস দ্বীপপুঞ্জের অধীনে ছিল। ওরা দিয়াগো গার্শিয়াকে নিজের অধীনে রেখে পরে মার্কিনীদের কাছে ইজারা দিয়েছিল।

৩১.৪.১ দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকা উপনিবেশিকতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ আফ্রিকাতে সাদা বসবাসকারীদের জনসংখ্যা ৩২ কোটির মধ্যে ৪.২ কোটি এবং কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মত একই উপায়ে ১৯১০ সালে এই বিদেশী বসবাসকারীরা ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। সেই ১৯১০ সাল থেকে শ্বেত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমস্ত রকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আফ্রিকান সংখ্যাগুরুদের শাসন করে আসছিল। ১৯১২ সালে যখন আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা হয়, তখন থেকেই ওখানকার অধিবাসীরা নিজেদের স্বাধীন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। আফ্রিকান ছাড়াও অন্যান্য এশিয় জাতি, ওখানে শিল্প শ্রমিক হিসাবে ইউরোপীয় আবাদে কাজ করছিল। ওদের সাথে যোগ দিয়েছিল শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশার কারিগরেরা। জনগণের একটি বড় অংশ ছিল ইউরোপীয়, আফ্রিকান এবং এশিয়া থেকে আগত মাতাপিতার মিশ্র বংশজাত। দক্ষিণ আফ্রিকায় ৮৩ শতাংশ অধিবাসী আফ্রিকান। আইনের সাহায্যে এদের বৈষম্য মূলক ভাবে পৃথক করে রাখা হয়েছিল। শ্বেতসংখ্যালঘুরা আইনের সাহায্য অবলম্বন করে বৈষম্য মূলক নীতির দ্বারা দেশ শাসন করে এসেছে।

বর্ণবৈষম্যের অর্থ শ্বেতাঙ্গদের থেকে আফ্রিকান এবং অন্যান্য বর্ণের (এশিয়ানরাও অন্তর্ভুক্ত) গোষ্ঠীকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আলাদা করে রাখা। শ্বেতগোষ্ঠীর যুক্তি অনুযায়ী ভিন্নবর্ণে এবং জাতির ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি এবং সভ্যতা বজায় রাখতে হলে পৃথকভাবে চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। এই কারণ দেখিয়ে শাসকগোষ্ঠী ওদের বাসস্থান সংরক্ষিত ও আফ্রিকানদের বাস্তুভিটা এলাকা পৃথক করে দিয়েছিল। যেহেতু সাদারা ৮.৭ শতাংশ জমি সংরক্ষিত করে রেখেছিল — জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ আফ্রিকানরা শুধুমাত্র ১৩ শতাংশ জমিতে বসবাস করবে এই আশা করছিল। এই ব্যবস্থা কার্যকর করা অসম্ভব ছিল, কারণ সমস্ত আফ্রিদিরা তথাকথিত অ-আফ্রিদি এলাকাগুলিতে বিদেশী বা বহিরাগত হিসাবে চিহ্নিত হত। ওদের ওপরওয়ালার কাছ থেকে প্রশাসনিক অনুমতির প্রয়োজন হত। আফ্রিদিদের খুব কম বেতন দেওয়া হত অথচ ওই একই কাজের জন্য একজন ইউরোপীয় কর্মচারী অনেক বেশি বেতন পেত।

আফ্রিদিরা আপত্তি তুলল এই বর্ণবৈষম্য আইন প্রবিধান, বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে। ওদের যুক্তিতে এই বর্ণবৈষম্যের নীতি শুধু অযৌক্তিক নয় অমানবিকও। ওরা বলল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা উন্নয়ন প্রকল্প থাকতে পারে না। আফ্রিকানরা বর্ণবৈষম্যের বিলুপ্তি এবং গণতন্ত্রের দাবি জানাল। শ্বেত শাসকগোষ্ঠী এই বর্ণবৈষম্য নীতিকে বদলে ফেলতে রাজি হল না। এই নীতি সন্ত্রস, হিংস্রতা, সামরিক এবং পুলিশি দমনের সাহায্যে

আফ্রিকানদের রাজনৈতিক দাবিকে বঞ্চিত করেছিল। বহু পশ্চিমী শক্তি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচুর বিনিয়োগ করেছিল এবং সেখানকার সামরিক শক্তির সাথে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ বজায় রেখেছিল। এর ফলে বর্ণবৈষম্য শাসন ব্যবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠতে লাগল।

আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসীরা অভ্যন্তরীন শ্বেত শাসকদের বিরুদ্ধে এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সূচনা হবে কিনা গভীরভাবে নির্ভর করছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের স্বার্থসিদ্ধির উপর।

৩১.৪.২ নামিবিয়া

দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকাতে আরও একটি দেশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছিল — তার নাম নামিবিয়া। নামিবিয়ার ঔপনিবেশিকতা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮০ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ দেশীয় মানুষের সংহার করার পর এই এলাকাটি জার্মান উপনিবেশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা জার্মানির কাছ থেকে নামিবিয়া দখল করে নেয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ সরকারকে নিয়োগ করে নামিবিয়াকে শাসনের অধিকার দিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিগত বৈষম্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত হয়েও ইংরেজ দক্ষিণ আফ্রিকাকে নামিবিয়া শাসনের ভার দেয়। জাতিসংঘের নিয়মানুসারে ওই শাসন ব্যবস্থা "সাধারণের সর্বাধিক নৈতিক এবং সামাজিক উন্নতি বর্ধন করবে।" কিন্তু এর পরিবর্তে দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের এলাকা শ্বেত উপনিবেশকারীদের জন্য খুলে দিয়েছিল এবং পক্ষপাতমূলক আইন ও বিধিনিষেধ চালু করেছিল।

এই ইউরোপীয় উপনিবেশকারীদের পরিকল্পনামাফিক ১৯১৫ সালে যে জনসংখ্যা ছিল ১৫,০০০ — সেটা বেড়ে গিয়ে ১৯৪৯ সালে দাঁড়ায় ৫০,০০০। বেশির ভাগ আফ্রিকানরা তাদের জমি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং নিরুপায় হয়ে ওদের শ্বেত উপনিবেশীদের অধীনে কাজ করতে হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দ্বারা প্রদত্ত শাসন ব্যবস্থার অস্বীকার ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ পরিবর্তিত হয় 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' নামে। জাতিসংঘ প্রদত্ত শাসন ব্যবস্থার বদলে (আছি ব্যবস্থা) চালু করা হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্যে নতুন করে জনসাধারণের সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রসংঘের রদবদলকে স্বীকার করতে অস্বীকার করে। দক্ষিণ আফ্রিকার বক্তব্য ঃ ওরা জাতিসংঘের নিয়মবিধি মেনে নিতে রাজি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নয়। এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। জাতিসংঘের প্রদত্ত শাসন ব্যবস্থার অবসান হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা। দক্ষিণ আফ্রিকা নামিবিয়াকে নিজেদের দখলে রেখেছিল এবং রাজ্যে বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি চালু করেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমর্থন করছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, কানাডা, পশ্চিম জার্মানি এবং জাপান। ১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রসংঘ আরও একটা পদক্ষেপ নিল। নামিবিয়াকে কাউনসিলের প্রশাসনের হাতে তুলে দিল যতক্ষণ না ওই রাজ্য স্বাধীনতা অর্জন করছে। এর চার বছর পরে আন্তর্জাতিক আদালতের (১১ বছর পরে) নির্দেশ এল দক্ষিণ আফ্রিকা বেআইনী ভাবে অধিকৃত নামিবিয়াকে ফিরিয়ে দিক। নামিবিয়া কাউনসিল ১৯৬৮ সালের মধ্যে নামিবিয়াকে স্বাধীনতা দেবে এই সিদ্ধান্ত নিল।

নামিবিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকা একটি নতুন সরকার গঠনে সচেষ্ট হয়। এই উদ্দেশ্যে, নামিবিয়ার টার্ন হলে একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়। এই সম্মেলন একটি নৃ-গোষ্ঠী নির্ভর শিথিল যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার প্রস্তাব দেয়।

এমন কয়েকটি গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা প্রদান করার প্রয়াস চলে যাদের উপর সহজেই নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে পরোক্ষভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করা যাবে — এই ধরনের গোষ্ঠীগুলিকে গণতান্ত্রিক টার্নহল জোট নামে একটি সাধারণ সংগঠনের অধীনে রাখার কথা ভাবা হয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও আফ্রিকার ঐক্য সংগঠন বা OAU কর্তৃক স্বীকৃত নামিবিয়ার জনসাধারণের প্রতিও SWAPO-র ক্ষমতা বা গুরুত্বকে অস্বীকার করা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জ, OAU এবং SWAPO পশ্চিমী দুনিয়ার সমর্থনে টার্নহল সমাধানকে অগ্রাহ্য করে।

জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের ৩৮৫ নং প্রস্তাবে স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে সমাধানের দাবি তোলা হয় এবং প্রধান পশ্চিমী শক্তি সমূহ যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি এবং ফ্রান্স একটি সংযোগ গোষ্ঠী (Contact Group) গঠন করে এই সমাধানের পথ সন্ধানের প্রয়াসী হয়। তবে এই সংযোগ গোষ্ঠী কেবলমাত্র দীর্ঘসূত্রতাকেই স্থায়ী করে তোলার একটি ব্যবস্থা হয়ে ওঠে? পশ্চিমী দুনিয়া চেয়েছিল SWAPO-র একটি বিকল্প গড়ে তুলতে কারণ ওই সংগঠনটি ক্রমশই সুসংগঠিত বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা সংযোগ গোষ্ঠীর কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করে নি। ১৯৭৮ সালে জাতিপুঞ্জ পুনরায় ৪৩৫ নং প্রস্তাবের মাধ্যমে নামিবিয়ায় নির্বাচনের দাবি তোলে এবং ৭৫০০ জনের একটি সামরিক বাহিনী ও জাতিপুঞ্জের বিশেষ মধ্যবর্ত্তী সহায়ক দল (Transitory Assistance Group)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে এটি হস্তান্তরের প্রস্তাব দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকা এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ১৯৭৮-এ একটি অর্থহীন নির্বাচনের অনুষ্ঠান করে যেখানে DTA-এর হাতে ক্ষমতা প্রদানের চেষ্টা হয়। এটি SWAPO এবং বর্ণবৈষম্য বিরোধী শক্তিগুলির স্বীকৃতি লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

সংযোগ তত্ত্ব বা Linkage Theory ঃ

এই সময় যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে যতক্ষণ না আঙ্গোলা থেকে কিউবার সৈন্যবাহিনী অপসৃত হচ্ছে ততক্ষণ নামিবিয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হবে না। এই দুই বিষয়ের মধ্যে সংযোগের সূত্র কিন্তু স্পষ্ট হয় না। SWAPO আঙ্গোলা ও কিউবার সেনাবাহিনীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অংশীদার এবং আঙ্গোলার সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণ সেখানকার নিরাপত্তা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। সুতরাং আঙ্গোলাও জানিয়ে দেয় যদি দক্ষিণ আফ্রিকা নামিবিয়া থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিয়ে SWAPO-র হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেয় তবে সেখান থেকে কিউবার বাহিনীকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

৩১.৪.৩ পশ্চিম সাহারা

উপনিবেশিকতার অপর একটি অবশিষ্ট পশ্চিম সাহারা। পশ্চিম সাহারা বর্তমানে সাহারা আরব গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত। এটি একটি মরুপ্রদেশ এবং আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। স্পেন এই ভূখন্ডের সমুদ্রতীরবর্তী শহরগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এই প্রভাব ১৮৮৫ সালের বার্লিন সম্মেলনে অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তি সমূহের সমর্থন পায়। ১৯৫৭ সালের ১৪ই নভেম্বর স্পেন মরক্কো এবং মরিটানিয়ার সঙ্গে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে ওই অঞ্চলটি পরিত্যাগ করে। সাহারা তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর অংশ মরক্কোর ভাগে পড়ে এবং দক্ষিণ অংশ মরিটানিয়ার অধীনে আসে — এরা দুই প্রতিবেশী দেশ। স্পেন নিজের জন্য মৎস্যপূর্ণ সমুদ্রাংশটি রাখে এবং ফসফেট খনি থেকে লাভের একটি বড় অংশের জন্য উপযুক্ত অঞ্চলে স্থায়ী হয়।

মরক্কোর আধকার লাভ ঃ

সর্বাপেক্ষা অধিক ফসফেট সমৃদ্ধ উত্তর অঞ্চলটি মরক্কো অধিকার করে। ফ্রান্স এই বিষয়ে আগ্রহী হওয়ায় মরক্কোর প্রতি সমর্থন জানায়। মার্কিন দেশ ফসফেটের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হিসাবে এই দুই দেশকে সমর্থন করে। এই সমর্থনকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে মরক্কো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সামরিক অস্ত্র কিনতে সম্মত হয়। ১৯৭৫ সালে মার্কিন অস্ত্র বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

পেলিসারিও (POLISARIO) ঃ

এই আগ্রাসন দমনের জন্য স্বভাবতই পশ্চিম সাহারায় রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনটি POLISARIO নামে পরিচিত। ফ্রাঙ্কো নামক নেতার মৃত্যুর পর স্পেন সাহারা আরব গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের উপর থেকে দাবি প্রত্যাহার করে। ১৯৭৮ সালে একটি সামরিক জোটের পর মরিটানিয়া শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং দক্ষিণ সাহারার উপর থেকে দাবি উঠিয়ে নেয়। POLISARIO দেশের তিন চতুর্থাংশ অধিকার করে এবং সেই অংশটি স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। OAU এই দাবি স্বীকার করে নেয় এবং একান্নতম সদস্য হিসাবে গণ্য করে।

মরক্কোতে একটি মুক্ত অবাধ রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত করে সাধারণ মানুষকে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার কথা ভাবা হয় কিন্তু এর ফলে মরক্কোর উপর অধিকার হারাবার ভয়ে কোন না কোন অজুহাতে এই সম্ভাবনা স্থগিত করে দেওয়া হয়।

এভাবেই সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা না করে ঔপনিবেশিক শক্তির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

৩১.৪.৪ দিয়েগো গার্সিয়া

ভারত মহাসাগরের একটি ছোট দ্বীপ দিয়েগো গার্সিয়া মরিশাস দ্বীপপুঞ্জের একটি অংশ। ১৯৬৫ সালে মরিশাস যখন ব্রিটেনের অধিকার থেকে স্বাধীনতা লাভ করে তখন দিয়েগো গার্সিয়া ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসাবে থাকবে বলে ভাবা হয়। চুক্তির ফলে দ্বীপের অধিবাসীরা মরিশাসের মূল দ্বীপে স্থানান্তরিত হন এবং ব্রিটেন তাদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ দেয়। ব্রিটেনের কাছ থেকে এই দ্বীপটি ইজারা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলে। বর্তমানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং মরিশাস, ভারত এবং অন্যান্য ভারত মহাসাগরীয় দেশগুলির ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। মরিশাসের জাতীয়তাবাদী শক্তি এই অঞ্চলটি ফিরিয়ে দেবার দাবি তোলে ও মার্কিন ঘাঁটি সরিয়ে নেওয়ার আর্জি জানায়। জাতিপুঞ্জ কিন্তু এই অঞ্চলটিকে ঔপনিবেশিক অঞ্চল বলে স্বীকার করে নি। এটিকে ঔপনিবেশিকতার অবশেষ বলে বিবেচনা করেছে।

ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে উপনিবেশিকতার নেতিবাচক অবদানগুলি হল — (১) তৃতীয় বিশ্বকে সামগ্রিকভাবে দারিদ্রে নিমজ্জিত করে পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলির উপর তাদের অর্থনৈতিক জীবনকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে দেওয়া এবং অর্থনীতিকে বিপন্ন ও বিকৃত করে তোলা, (২) অন্তঃ রাষ্ট্র সম্পর্কগুলি ভেঙে দেওয়া ও কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, (৩) সাংস্কৃতিক বিচারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে ধর্মীয় ও গোষ্ঠীগত বিবাদের বীজ বপন করা, (৪) ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির জটিলতা অব্যবহিত অবস্থায় রেখে যাওয়া।

৩১.৫ নয়া উপনিবেশবাদের বিবিধ রূপ

নয়া উপনিবেশবাদ বলতে বোঝায় পূর্বতন নির্ভরশীল দেশগুলির উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত রাখতে এক অদৃশ্য চাপের উপস্থিতি। প্রধানত এটি একটি বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি। এটি নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির সার্বভৌমিকতার প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। সদ্য স্বাধীন দেশগুলির আত্মনির্ভরতা, আর্থ-সামাজিক উন্নতি, দারিদ্র দূরীকরণ, শিল্পবাণিজ্যে পশ্চাৎপরতা প্রভৃতি প্রয়াসের উপর এই নয়া উপনিবেশিকতা, একটি প্রবল প্রতিবন্ধক স্বরূপ। উপনিবেশিকতার অবসান করে বৃহৎ বাণিজ্যিক সংগঠন, সামরিক ঘাঁটি, সামরিক হস্তক্ষেপ, গোপন তথ্যানুসন্ধান এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন ও গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকে গ্রাস করার প্রক্রিয়াটিই নয়া উপনিবেশবাদ; এই প্রক্রিয়ার কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ নেই। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সম্পর্ক আরোপ করে তাদের পুঁজিবাদী রাজনীতি ও অর্থনীতির অধীনস্থ করার যে চেষ্টা করে তাকেই বলা হয় নয়া উপনিবেশিকতা।

৩১.৫.১ তিনটি রূপ

নয়া উপনিবেশিকতার তিনটি রূপ আছে — অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক এবং সামরিক। অর্থনৈতিক রূপটির প্রকাশ ঘটে বৃহৎ একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুরি মুনাফা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সহায়তা আদায় করার মধ্যে, স্বল্পমূল্যে অবাধে কাঁচামাল সংগ্রহ করার মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের শিল্প ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যে, অর্থনৈতিক কৌশল ব্যবহার করে রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করার মধ্যে।

অর্থনৈতিক নয়া ঔপনিবেশিকাবাদের মূল উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতাপূর্ব সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কটি অবিকৃত রাখা। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেকিতার যুগে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলি খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বাগানশিল্পের প্রসার ঘটায় এবং জাতীয় সম্পদ ও সস্তা শ্রমমূল্যের সদ্ব্যবহার করে শোষণ প্রক্রিয়া চালাতে থাকে। এই ধরনের শিল্পসংস্থা, যেমন, United Africa Company স্থানীয় উৎপাদকদের জন্য সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং উচ্চমূল্যে সেগুলি বিক্রি করে উচ্চহারে মুনাফা করতে থাকে। আবার উৎপাদিত দ্রব্যগুলি উপনিবেশগুলিতে চড়া দামে বিক্রয় করে দ্বিগুণ লাভ করে। ১৯৬০ সালে Food And Agricultural Organisation-এর বিবরণীতে দেখা যায় আফ্রিকায় গাছের গুঁড়ি রপ্তানি ও কাঠের তৈরি দ্রব্যাদি আমদানির ব্যয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাতে প্রতি বছর ৪৩ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হচ্ছে। এটি কেবলমাত্র এক বছরে একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে হিসাব, সুতরাং কী পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

৩১.৫.২ অর্থনৈতিক রূপ

স্বাধীনতার পরেও এই বৃহৎ শিল্পসংস্থাগুলি সরে যায় নি। উপরন্তু তারা অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় করেছে। যেহেতু এরা একই সঙ্গে একাধিক দেশে সক্রিয় তাই এদের বলে বহুজাতিক সংস্থা বা MNC (Multi National Corporation)। এই সংস্থাগুলি বিভিন্ন দেশের উপর প্রায় পূর্ণ অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রেখেছে।

এরা উৎপাদন করে বা খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত করে, প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে, উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। ওই প্রস্তুত দ্রব্যগুলি বাজারজাত করা ও অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। যে সব জায়গায় বাণিজ্যিক ফসলের সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন, কেনিয়ার কফি, নাইজেরিয়ার চেরি বা ঘানার কোকো, সবই বহুজাতিক সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবেই প্রচুর মুনাফা অর্জন করে এবং সেই মুনাফা তাদের নিজের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে উৎপাদনকারী দেশগুলিকে নিঃস্ব করে দেয়।

তৃতীয় বিশ্ব যেসব কাঁচামাল রপ্তানি করে সেগুলির দাম এমনভাবে ঠিক করা হয় যাতে তাদের প্রায় কোন লাভ থাকে না বললেই চলে। এর পরে এগুলি বিক্রয় হলে পুনরায় বৈদেশিক সংস্থাগুলি লাভবান হয়। এটি একটি অসম সম্পর্ক গড়ে তোলে যার ফলে রপ্তানিকারী দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় মূল্য ক্রমশ নিম্নগামী হতে থাকে। এরা সংকটের মুখে পড়ে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংগঠনগুলির শরণাপন্ন হয়। বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক, পাশ্চত্য বাণিজ্য ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার (IMF)-এর কাছে ঋণের জন্য এরা হাত পাতে।

এই সংস্থাগুলি ঋণ দেওয়ার পূর্বে কতকগুলি শর্ত আরোপ করে। যেমন, অর্থের বিনিময় মূল্যকর অবমূল্যায়ন, সমাজসেবামূলক কাজে ব্যয় হ্রাস, সরকারী ভাতা হ্রাস অথবা ব্যক্তিগত বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি। এর ফলে গ্রহীতা দেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ক্রমশ এই দেশগুলি ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে কারণ এরা সুদ বা সার্ভিস চার্জ কোনটিই দিয়ে উঠতে পারে না। ১৯৭০ সালের পর থেকে অধিকাংশ দেশেই জনপ্রতি আয়ের হার হয় অবিচলিত রয়েছে অথবা হ্রাস পেয়েছে।

৩১.৫.৩ রাজনৈতিক রূপ

নয়া-উপনিবেশবাদী শক্তিগুলি উন্নয়নশীল দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। প্রধানত রাজনৈতিক ক্ষমতা যাতে সমাজের এমন একটি শ্রেণির হাতে থাকে যারা বিদেশী শক্তির মদতপুষ্ট সেদিকে লক্ষ্য রাখে। এই শ্রেণির মানুষেরা বহুজাতিক সংস্থাগুলি থেকে কমিশন বা চাকরির সুযোগ পায়। ক্ষমতা যাতে এই শ্রেণির হাত থেকে প্রকৃত পরিবর্তনবাদীদের হাতে চলে না যায় সেদিকে এরা কড়া নজর রাখে। এই কারণেই এরা সামরিক শাসক, রাজা বা অপ্রিয় নেতাদের মদত দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এরা ইথিওপিয়ার হাইলে সেলেসি বা ইরানের শাহ বা দক্ষিণ কোরিয়ার শাসক গোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল।

যদি কোনভাবে পরিবর্তনবাদীদের হাতে ক্ষমতা চলে যায়, নয়া উপনিবেশবাদীদের লক্ষ্য থাকে সামরিক অভ্যুত্থান বা হত্যার কৌশলে তাদের সরিয়ে দেওয়া। ১৯৫৩ সালে ইরানে মোসাদেকের অপসারণ, ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালায় আরবেঞ্জ সরকার, ১৯৬৬ সালে কোয়ামে এনক্রোমা নামক ঘানার রাষ্ট্রপতি, ১৯৭৩ সালে চিলির আলেয়ান্দে, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যা প্রভৃতি ঘটনা এই সত্যই প্রমান করে। মোজাম্বিক, আঙ্গোলা, ইথিওপিয়া, কাম্পুচিয়া, আফগানিস্তান, নিকারাগুয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও সরকারকে গদিচ্যুত করার চেষ্টা চলেছে।

৩১.৫.৪ সামরিক শক্তির ভূমিকা

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর প্রভাব অক্ষুন্ন রাখার জন্য নয়া ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি তাদের সামরিক ক্ষমতা ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুঁজিবাদী শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি অঞ্চলগুলির সঙ্গে চুক্তি করে যাতে ওইসব দেশে সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে বিশেষ সামরিক শিবিরে যোগ দিতে কোন কোন তৃতীয় বিশ্বের দেশকে বাধ্য করা হয়। এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্যারিবিয়া ও আফ্রিকায় অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। মার্কিন কেন্দ্রিয় কম্যান্ডের অধীনে রয়েছে প্রায় ২,২২,০০০ সামরিক কর্মী এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, পারস্য উপসাগর ও আফ্রিকার উনিশটি জাতি-রাষ্ট্র। অধিকাংশ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সামরিকব্যয় অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে দেশের মোট ব্যায় বরাদ্দের ৫০ শতাংশ হয়ে উঠেছে। এইসব দেশে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র জমা হয়েছে কারণ অস্ত্র উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের আগ্রহে এইসব দেশে সর্বদাই সশস্ত্র বিরোধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে কারণ তাদের স্বার্থ এতেই নিহিত হয়েছে। অনেক সময়ই সামরিক ঘাঁটি তৈরি করার উদ্দেশ্য হল অপর একটি দেশকে সন্ত্রস্ত ও ভীত করে তোলা, যেমন দিয়েগো গার্সিয়া ও পাকিস্তানে অস্ত্র সম্ভার বৃদ্ধির ফলে সর্বদাই ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন ও বিঘ্নিত হচ্ছে।

তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬০ সালে বেলজিয়ামের বাহিনী মার্কিন সমর্থনে পুষ্ট হয়ে কঙ্গোতে প্রেরিত হয় যাতে সেখানকার পশ্চিম-সমর্থক নেতৃবৃন্দ সহায়তা পায়। ১৯৭৮ সালে ফরাসী ও বেলজিয়ামের বাহিনী মার্কিন বিমানে পুনরায় জায়রে প্রেরিত হয় কাটাঙ্গা অভ্যুত্থান দমনের উদ্দেশ্যে। ১৯৮৫ সালে ফরাসীরা চাডে (Chad) হস্তক্ষেপ করে।

প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ঘটনা না ঘটলেও সামরিক ঘাঁটির প্রভাব একটি দেশের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। এগুলি ক্ষমতা, মর্যাদা ও গুরুত্বের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয় কারণ যেসব দেশ এই ঘাঁটিগুলি পরিচালনা করে তারা এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমেই নিজ নিজ ক্ষমতা প্রচার ও ব্যবহার করে। এই কেন্দ্রগুলির সাহায্যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে প্রত্যক্ষ্য সামরিক শক্তি ব্যবহার না করেও প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়।

উপরে আলোচিত নয়া উপনিবেশবাদের তিনটি রূপই পরস্পর সংশ্লিষ্ট, তবে অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারই মূল যোগসূত্র।

৩১.৬ বর্ণবৈষম্য একটি অবৈজ্ঞানিক মতাদর্শ এবং নয়া উপনিবেশিকতাবাদের সহায়ক

বর্ণবৈষম্যের তত্ত্ব প্রচার করে, কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিরা পশ্চাৎপর এবং নিকৃষ্ট শ্রেণির মানুষ। এর ফলে বিভিন্ন বর্ণবৈষম্যমূলক কুসংস্কারের জন্ম হয়েছে। পশ্চিমী শক্তিগুলির আফ্রিকার দাসব্যবসা চালানো ও আফ্রিকার উপর চরম ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা এই কথাই প্রমান করে। বহু পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকার কালো মানুষদের প্রতি বিভিন্ন ভাবে পীড়ন চালানো হয়, তাদের সমাজ জীবনকে নিচু মর্যাদা দেওয়া হয়। উপনিবেশগুলিতে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রচার করে যে আফ্রিকার মানুষেরা সহজাত ভাবেই বুদ্ধির দিক থেকে নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসক দীর্ঘদিন ধরে সেখানকার মানুষদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালিয়েছে।

৩১.৬.১ বর্ণ (Race) শব্দটির অর্থ

আক্ষরিক অর্থে বর্ণ শব্দটি গাত্রবর্ণ বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত, এর সঙ্গে সমার্থক হয়ে পড়েছে জাতি বা সম্প্রদায়। সাধারণভাবে একটি গোষ্ঠীর মানুষ যখন একই সংস্কৃতিতে লালিত হয়, একই ইতিহাস, ভাষা ও ব্যুৎপত্তিগত পরিমন্ডলে বসবাস করে তখন তারা একটা জাতি গড়ে তোলে। জৈবিক সাদৃশ্যও সম্প্রদায়গত ঐক্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গাত্রবর্ণ, চুলের রং, চোয়াল ও নাকের গড়ন প্রভৃতির ভিত্তিতে সমগ্র মানব সমাজকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় — নিগ্রয়েড (কালো), মঙ্গোলয়েড (পীত), এবং ককেসয়েড (সাদা)। দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে মানুষের মূল দেহগত ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উপর যে মানুষের বুদ্ধি বা মননশক্তি নির্ভর করে না তা প্রমাণিত হয়েছে। ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যারা এই বর্ণের ধারণাটি প্রবর্তন করেছে তারা এশিয় ও আফ্রিকার অধিবাসীদের উপর নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই এটি করেছে।

বর্ণবৈষম্যের তাত্ত্বিকদের মধ্যে — (ক) মানবজাতি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এই দুই দলে বিভক্ত, (খ) উৎকৃষ্ট জাতির প্রচেষ্টার ফলেই সামাজিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে, (গ) সামাজিক ইতিহাস একটি নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণগত যুদ্ধ যার পরিণতি উৎকৃষ্ট জাতির জয়।

যেহেতু এই বর্ণবৈষম্যের তত্ত্ব আদৌ বৈজ্ঞানিক নয়, সেহেতু ইতিহাসের বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে এই তত্ত্বের সংঘাত অনিবার্য। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে মানুষের পরিশ্রমের ফলে, কোন বিশেষ বর্ণের মানুষের সহজাত কৃতিত্বের কারণে নয়। প্রকৃতির উপাদানগুলির উপর কর্তৃত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যেই মানুষ পরিশ্রম করেছে এবং তারই ফলে সামাজিক সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটেছে।

৩১.৬.২ বর্ণ বা জাতি শোষণের একটি হাতিয়ার

অশ্বেতাঙ্গ মানুষ, বিশেষত আফ্রিকার অধিবাসীদের স্বাধীন উন্নয়নের অপারগতার কথা প্রচার করে বর্ণবিদ্বেষকে ইউরোপীয় শাসন কায়েম রাখার একটি কৌশল হিসেবে ক্রমাগত প্রচার করা হয়েছে। বিকৃত প্রচার ও পুনঃ পুনঃ একটি বিশেষ ধারণা আরোপের মধ্য দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে শোষণমুখী অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের পরিবর্তন প্রভৃতির প্রয়াস।

আদর্শগত আরোপ এতই তীব্র যে অ-শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিরা নিজেদের অজান্তেই এই ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছে। যদিও এই বিশ্বাসের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তবু মানবসমাজের একটি বড় অংশের মধ্যেই এই ধারণা প্রচারিত হয়ে গেছে যা থেকে তাদের মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী এই উদ্দেশ্যে মানবসমাজের সকল সন্তানকে পরস্পরের ভাই বলে বর্ণনা করে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করতে চেয়েছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দ পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় গাত্রবর্ণের ভিত্তিতে বিভেদের ধারণা অজ্ঞাত ছিল। সেই সময় ধর্ম, স্থান ও শ্রেণির ভিত্তিতে মানুষে বিভাজন হত। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের বিভেদের ধারণার মধ্যেই কিন্তু নিচুশ্রেণির মানুষের উপরের শ্রেণিতে আরোহণের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ কোন বৈশিষ্ট্যকেই জন্মগত বলে স্থায়ী চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয় নি। বর্ণগোষ্ঠীগুলিকে অনড় বলে বিবেচনা করা হয় নি। কেবল সামরিক শক্তিতে উন্নত হতে পারলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এমন একটি ধারণা প্রচলিত ছিল।

ইউরোপীয় উপনিবেশিকতাবাদীগণ দাসব্যবসা, বাণিজ্য, লুঠ, গণহত্যা প্রভৃতির সাহায্যে আফ্রিকা মহাদেশকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলে এবং প্রচার করে যে তাদের বর্ণগত অক্ষমতাই আফ্রিকীয়দের পশ্চাৎপদতার একমাত্র কারণ। তাদের তত্ত্বে বলা হয় ইউরোপের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পিছনে রয়েছে তাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব।

৩১.৬.৩ ঔপনিবেশিক ক্রিয়াকলাপ ও তার প্রভাব

আফ্রিকার যেসব অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শক্তির বিস্তৃত হয়, সেখানেই বর্ণবৈষম্যের বীজ ছড়িয়ে পড়ে। এই সব স্থানের মনোরম জলবায়ু সম্পন্ন, খনিজদ্রব্যে ধনী, কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনের দিক থেকে উর্বর অংশগুলি ইউরোপীয় বাসিন্দাদের হস্তগত হয়। দেশীয় মানুষের হাত থেকে ভূমির অধিকার চলে যায়। আফ্রিকা ও এশিয়ার মানুষেরা অতি অল্প পারিশ্রমিকেও কাজ করতে রাজি হওয়ায় তারা চিরকালের জন্য শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার যাবতীয় সম্ভাবনাও বিনষ্ট হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকেও তারা সরে যেতে বাধ্য হয়। তাদের রাজনৈতিক দলগুলি নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। বর্ণবৈষম্য এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষদের মনুষত্যের প্রাণীতে পরিণত করে।

আফ্রিকার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ওই দেশের অনেকেই শিক্ষিত হয়ে ওঠেন ও কবি, ঔপন্যাসিক নাট্যকার, ঐতিহাসিক, অভিনেতা, দার্শনিক, আইনজ্ঞ, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে। এদের ধ্যানধারণার প্রসার ঘটায় সাধারণ মানুষ তথা তাত্ত্বিকরা সবাই বুঝতে পারেন যে বর্ণবৈষম্যের তত্ত্বটি সম্পূর্ণই অবৈজ্ঞানিক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূচনা করে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের বর্ণবৈষম্য বিরোধী মনোভাব এদের মনে তথা বিশ্ববাসীর মনে রেখাপাত করে, এর ফলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর স্বার্থরক্ষার জন্য এই ধরনের একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যার প্রকৃতপক্ষে কোন ভিত্তি নেই।

৩১.৬.৪ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম

ভারতবর্ষ প্রথম থেকেই বর্ণবৈষম্য বিরোধী নীতি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করে আসছে। কেননা, বর্ণবৈষম্য ঔপনিবেশিকতারই একটি অংশ। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকেই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে এবং এটি যে একটি অত্যন্ত গর্হিত সংস্কার সেটি অনুধাবন করা হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ এবং অহিংসামূলক কর্মসূচী প্রথম মানবাধিকারের প্রশ্নটিকে সম্মুখে নিয়ে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধীজী, বর্ণবৈষম্য অ-মানবিক অত্যাচার এবং শোষণের যে কদর্য চেহারা সেখানে দেখে এসেছিলেন সে কথা প্রচার করেন এবং ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যে কোন আন্দোলনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বর্ণবিরোধী আন্দোলনকে যুক্ত করার কথা বলেন। ১৯৪৬ সালে জাতিপুঞ্জের ভারতবর্ষ এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া ফেলে দেয়।

বর্ণবৈষম্য বিরোধী কর্মসূচীর প্রধান সূত্র সমূহ ঃ

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার প্রথম অধিবেশনে ভারতবর্ষ বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করে। তখনও পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের ভিতর ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহেরই প্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ সদস্যই বৈদেশিক প্রাধান্য ও পীড়ন থেকে মুক্তি খুঁজছিল। ভারতবর্ষ উপনিবেশগুলির পক্ষ নিয়ে বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের জন্য উদ্যোগ নেয়। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনেও ভারত একই ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করতে থাকে। ভারতের মতে বর্ণবৈষম্য মানবিকতার বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রতিফলন, শোষণ ও অত্যাচারের নিদর্শন এবং এই বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসকে সমূলে বিনাশ করতে হবে। কারণ এই ধারণার সংস্কার সম্ভব নয়।

বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় উদ্যোগ ঃ

জাতিপুঞ্জ ও ভারত শেষ পর্যন্ত তিনটি সূত্রের ভিত্তিতে এই আন্দোলন শুরু করে — (১) বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে না। (২) এ ধরনের নীতি যে কোন দুটি রাষ্ট্রের সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে এটি মেনে দিতে হবে। (৩) বর্ণবৈষম্যকে জাতিপুঞ্জের সনদে মানবাধিকার সম্পর্কে সার্বজনীন ঘোষণার বিরোধী বলে বিবেচনা করা হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য জাতিপুঞ্জ যাতে প্রয়াসী হয় ভারত সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ১৯৫৫ সালের স্বাধীনতা সম্পর্কিত সনদে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস সাম্য ও গণতন্ত্রের দাবি তোলে। কিন্তু ওই দেশের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা ৬৯ জন ব্যক্তিকে হত্যা করে। প্রায় ৪০০ জনকে আহত করে, এবং ১৯৬১ সালে নিরস্ত্র প্রতিবাদীদের উপর গুলি চালিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি গড়ে তোলে।

বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঃ

ভারতীয় উদ্যোগে জাতিপুঞ্জ একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে এবং সাধারণ সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যাতে সদস্য রাষ্ট্রগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের বর্ণবৈষম্য সম্পর্কিত নীতিগুলি পরিহার করতে বাধ্য করে।

নেহরু দক্ষিণ আফ্রিকাকে জাতিপুঞ্জ ও কমনওয়েলথ থেকে বহিষ্কারের দাবি তোলে। পাশ্চাত্য শক্তিগুলি পরোক্ষে বর্ণবিদ্বেষকে সমর্থন করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

১৯৬৭ সালে আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেস বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের প্রকৃত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই সংগঠন সমগ্র এশিয়ার সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। কয়েক বছর পরে ভারতবর্ষ SWAPOকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় এবং নিজেদের বৈদেশিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। নেলসন ম্যান্ডেলাকে 'নেহরু পুরস্কার' দিয়ে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। প্রতিবেশিদের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট হয়। উদ্বাস্তু শিবিরগুলি আক্রান্ত হতে থাকে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন সংগঠনগুলি এদের যাবতীয় উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করলেও এরা হতোদ্যম হয়না।

আফ্রিকা ভান্ডার ঃ

ভারতীয়দের উদ্যোগে একটি অর্থভান্ডার খোলা হয় যাতে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলিকে সাহায্য করা যায়। উপনিবেশিকতা ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে যে কোন উদ্যোগকেই যাতে রোধ

করা যায় সেজন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। সমস্ত পৃথিবী এই দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা নিয়ে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তার প্রধান কৃতিত্ব ভারতই দাবি করতে পারে।

৩১.৭ অনুশীলনী

১। নয়া উপনিবেশবাদ কী? (দশ পংক্তির মধ্যে উত্তর লিখুন)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। নিম্নোক্ত বিষয়টি সযত্নে অনুধাবন করুন এবং সঠিক উত্তরের পাশে দাগ (✓) দিন।

বর্ণবাদকে এইভাবে দেখা যায় —

(ক) এটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ

(খ) নয়া উপনিবেশবাদের হাতিয়ার

(গ) একটি অবৈজ্ঞানিক মতাদর্শ কারণ মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সম্ভাবনার শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতাকে এটি জড়িয়ে ফেলে।

(ঘ) (খ) এবং (গ) উভয়ই।

৩। বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আন্দোলন কোন্ তিনটি মূল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত?
(দশ পংক্তির মধ্যে উত্তর লিখুন)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

একক ৩২ □ পারমাণবিক বিশ্বে শান্তির সমস্যা

৩২.১ প্রস্তাবনা

৩২.২ পারমাণবিক শক্তির প্রকৃতি

৩২.২.১ পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণাম

৩২.২.২ পারমাণবিক শৈত্য ও তার ফল

৩২.২.৩ পারমাণবিক অস্ত্রে প্রসারণ

৩২.৩ বৃহৎশক্তি ও বিশ্ব সামরিক ব্যবস্থা

৩২.৪ শান্তি আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা

৩২.৪.১ পশ্চিমে শান্তি আন্দোলন

৩২.৪.২ যুদ্ধ প্রসঙ্গে গান্ধীর মত

৩২.৫ সারাংশ

৩২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৩২.১ প্রস্তাবনা

বর্তমান বিশ্বের সমাজব্যবস্থা পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বারা সংক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনায় সর্বদা সন্ত্রস্ত। এই সকল অস্ত্রের ব্যাপক ও অবাধ ব্যবহার বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে। হিরোশিমা ও নাগাশাকির উপর মার্কিন বোমা নিক্ষেপ প্রমাণ করে এই অস্ত্রসমূহ কতখানি বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এ জন্যই শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। মহাশক্তিগুলির মধ্যে আলোচনা আদানপ্রদান এবং জাতিপুঞ্জের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতীত এই প্রয়াস সফল হওয়া সম্ভব নয়। পারমাণবিক ও সাবেক অস্ত্রসমূহের উৎপাদন রোধ করা নিরস্ত্রীকরণের প্রথম পদক্ষেপ।

৩২.২ পারমাণবিক শক্তির প্রকৃতি

১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই নিউ মেক্সিকোতে প্রথম পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিধ্বংসী অস্ত্র 'মহাপ্রলয় যন্ত্র' বা 'Doomsday Machine' হিসেবে পরিচিতি পায়। প্রথম বিস্ফোরণ একটি বিশাল আকৃতির ব্যাঙের ছাতার মতো আগুনের মেঘ সৃষ্টি করে যা ছিল আকাশে প্রায় ৪০,০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত বিস্তারিত। এটি

'পারমাণবিক ছত্রাক' বা 'ছত্রাক মেঘ' নামে পরিচিত। এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে হিরোশিমা ও নাগাসাকি বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। নয় হাজার পাউন্ড ইউরেনিয়াম বোমা হিরোশিমার ১৮৯০ ফুট উপর থেকে নিক্ষিপ্ত হয় এবং অর্ধমাইল পরিধি বিস্তার করে একটি জ্বলন্ত অগ্নিগোলক সৃষ্টি করে। এটির কেন্দ্রে উষ্ণতা ছিল ·৫০ মিলিয়ন ডিগ্রি ফারেনহাইট।

সমগ্র যুদ্ধের ইতিহাসে যা ঘটেনি তাই এই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ঘটল। সমস্ত অঞ্চলটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং কতজন যে নিহত হয় তার কোন নিশ্চিত পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ৭০ হাজার থেকে আড়াই লক্ষ লোক নিহত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয় এবং আর অগণিত মানুষ আহত হয়। প্রায় ৫৫ হাজার বাড়ি নিশ্চিহ্ন ও নষ্ট হয় যার মধ্যে ২০০০ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে য়ায়।

এই বিবরণ প্রমাণ করে পারমাণবিক অস্ত্রনিক্ষেপ কতখানি বিধ্বংসী হতে পারে। বৃহৎ শক্তিগুলি যে ধরনের অস্ত্র সংগ্রহ করেছে তা থেকে সমগ্র পৃথিবী বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে। হিরোসিমা যেভাবে বিনষ্ট হয়েছিল তার ৬০০ গুণেরও বেশি বিস্ফোরক অস্ত্র এখন বৃহৎ শক্তিগুলির হস্তে রয়েছে।

৩২.২.১ পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণাম

১৯৪৫ সালে যখন প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্রের সূচনা করে তারপর থেকেই সকল বৃহৎ শক্তি পারমাণবিক শক্তি সংগ্রহ করে চলেছে। পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় দিক থেকেই বিশ্ববাসী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রায় পঁচিশ পছর আগে রাষ্ট্রপতি কেনেডি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখান যে যদি একটি পূর্ণাঙ্গ পরমাণু যুদ্ধ হয় তবে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন, ইউরোপীয় এবং রাশিয়ান নাগরিকের মৃত্যু হবে এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে। এই ধরনের যুদ্ধে মৃত ও জীবিতের মধ্যে পার্থক্যের কোন অর্থ হয় না কারণ এই সর্বধ্বংসী যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। বৃহৎ শক্তিগুলি কেবল নিজেদের দেশের স্বার্থের কথাই চিন্তা করেছে কিন্তু চীন ও ভারত যদি আক্রান্ত হয় তবে বহু বেশি সংখ্যক মানুষ নিহত হবে কারণ এই দেশগুলি অত্যন্ত জনবহুল।

৩২.২.২ পারমাণবিক শৈত্য ও তার ফল

পারমাণবিক যুদ্ধের অপর একটি দিকও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পৃথিবীর কোন কোন প্রান্তে তাপমাত্রা অত্যন্ত হ্রাস পায় এবং হিমপ্রবাহ বইতে থাকে। বোমা বিস্ফোরণের ফলে প্রচুর পরিমাণে ধুলি ও অন্যান্য পদার্থ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। এর পরে যে ধুলোর মেঘ সৃষ্টি হয় তা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে না এবং এর ফলে এক দীর্ঘস্থায়ী শীতাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এই চরম শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে কোন প্রাণের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না।

পরবর্তী পর্যায়ে আবার এক নূতন বিপদের সূচনা হবে। ওজোন স্তর পৃথিবীর প্রাণীজগতকে সুরক্ষিত রাখে যা পরমাণু যুদ্ধের ফলে সম্পূর্ণ জ্বলে যাবে। সুতরাং যেটুকু প্রাণ অবশিষ্ট থাকবে তা অতিবেগুনী রশ্মির সামনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এই রশ্মির বিকীকণে ক্যান্সার ও অন্ধত্বের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান পৃথিবীতে যে পরিমাণ পরমাণু শক্তি সঞ্চিত রয়েছে তার এক চতুর্থাংশই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। যে কোন একটি পক্ষের অস্ত্র সম্ভারই এটি সম্ভব করে তুলতে পারে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে কোন পক্ষ জয়ী হবে এ নিয়ে অনুমান করা নিষ্ফল। এই সম্ভাবনাকে যে কোন মূল্যে রোধ করাই এখন জরুরি।

৩২.২.৩ পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসারণ

পারমাণবিক অস্ত্রসমূহের কিন্তু সম্ভাব্য কোন সামরিক ভূমিকা নেই। এরা সর্বাত্মক ভাবে হত্যা করার জন্যই নিযুক্ত। কারণ যে এই অস্ত্র ব্যবহার করবে সে নিজেও এর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। ১৯৬৮ সালে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাসও রোধ করার জন্য অস্ত্র সংবরণ করার শপথ গ্রহণের কথা চিন্তা করা হয় এবং Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT) স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি নতুন করে আর পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ করবে না এবং কোন রূপ পরীক্ষা করবে না একথা স্থির হয়। এই প্রচেষ্টার ফলে বিধ্বংসী যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে বলে মনে করা হয়।

কিন্তু এই অস্ত্র সংগ্রহের নেশা প্রতিটি দেশকেই আকর্ষণ করে। যেখানে দুনিয়া জুড়ে বেকারত্বের সমস্যা রয়েছে সেখানে লক্ষ্য করার বিষয়, পরমাণু উৎপাদক কেন্দ্রগুলি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় এবং সেখানে শ্রমিকরা দিনরাত কাজ করে চলেছে ও তাদের চাকরির নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হচ্ছে না।

দেখা যাচ্ছে ক্রমাগত পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, সুতরাং যতক্ষণ না বৃহৎ শক্তিগুলিকে পরমাণু অস্ত্র বৃদ্ধি করা থেকে নিরস্ত করা যাচ্ছে ততক্ষণ কোন লাভ হবে না। বরং কেবল যেসকল দেশে পরমাণু অস্ত্রসম্ভার নেই তারা যাতে কখনোই এই অস্ত্র উৎপাদন করতে না পারে তার জন্যই বিভিন্ন চুক্তি করা হচ্ছে। এর ফলে একদল শক্তির হাতে সমস্ত ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে এবং অন্য দলের হাতে কোন ক্ষমতাই থাকছে না। 'অনুভূমিক অস্ত্র বৃদ্ধি' রোধ হচ্ছে অথচ 'উল্লম্ব অস্ত্রবৃদ্ধি' নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেন ১৯৬৮ সালের চুক্তিটির জন্য উদ্যোগ নেয় কিন্তু তখন থেকেই ভারত এর বিরোধিতা করে কারণ এর ফলে পরমাণু-নিরপেক্ষ দেশগুলি আরো পরনির্ভর ও সদাসন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ২৮,০০০ পারমাণবিক অস্ত্র বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করে। সকল বৃহৎ শক্তিরই মনোভাব এই ধরনের। সুতরাং অস্ত্র সম্বরণ পুরোপুরি একদেশদর্শী ও অর্থহীন।

এই ধরনের আন্তর্জাতিক নীতিবোধের মান প্রমাণ করে কোন সম্ভাবনাময় দেশই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নিজেদের অক্ষমতা বৃদ্ধি করবে না। কারণ বৃহৎ শক্তিগুলি নিজেদের ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলবে এবং অন্যদের অস্ত্র উৎপাদনে নিরস্ত করবে। বিশ্ববাসীকে ধ্বংস করে দেওয়ার এই ক্ষমতা যা বৃহৎ শক্তিগুলির রয়েছে তাকেই বলা হয় পারমাণবিক প্রবল হত্যাস্পৃহা বা overkill.

৩২.৩ বৃহৎশক্তি ও বিশ্ব সামরিক ব্যবস্থা

পারমাণবিক অস্ত্রের প্রকৃতিও বৃহৎ শক্তিগুলির আচরণকে নির্ধারণ করে, এবং বিশ্বের সামরিক ব্যবস্থার প্রকৃতিও এর দ্বারা নির্ধারিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া এই উভয় বৃহৎশক্তিই তাদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত

করতে চায় এক 'ভীতিসাম্য অবস্থার' (Balance of Terror) মাধ্যমে। অর্থাৎ এরা উভয়েই এতখানি পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করতে চায় যাতে অন্যকে ধ্বংস করা যায়, এমনকি প্রথমেই আক্রান্ত হলে। একেই বলে Second Strike Capacity-এর অর্থ দুরকম ঃ

প্রথমত এটা অর্জন করতে গেলে প্রতিটি বৃহৎশক্তিকে উত্তরোত্তর উন্নত সমরাস্ত্র উৎপাদন করতে হবে, যার অর্থ অধিকতর বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পন্ন মারাত্মক বোমার উৎপাদন যা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানতে সক্ষম। এক্ষেত্রে একটি বৃহৎ শক্তির সাফল্যের সঙ্গে অন্য বৃহৎ শক্তির পাল্লা দিতে বাধ্য। অতএব উভয় বৃহৎশক্তিই পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় ভূগর্ভে, যেহেতু মনে করা হয় যে এতে পরিবেশ বিপন্ন হবে না।

দ্বিতীয়ত এইসব পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদনের পর এগুলিকে এমন স্থানে সংরক্ষিত করতে হয় যাতে তা অন্য বৃহৎশক্তির নাগালের বাইরে থাকে। অতএব এগুলিকে হয় গোপনে ভূগর্ভে সঞ্চিত করতে হয় অথবা সমুদ্রে ভ্রাম্যমান সাবমেরিন বা অন্য কোন জলযানে সন্তর্পণে সংরক্ষিত করা হয়। এগুলিকে আবার মহাকাশে কোন উপগ্রহে অথবা গ্রহেও স্থাপন করা যেতে পারে। অস্ত্রগুলির জন্য এমন ব্যবস্থা থাকে যাতে একটিমাত্র বোতাম টিপেই সেগুলিকে কার্যকর করা যায়। তবুও বৃহৎশক্তিবর্গ বিশ্বকে এই আশ্বাস দেয় যে আকস্মিকভাবে কোন পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হবে না। এই আশ্বাসের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে পারমাণবিক অস্ত্র আগেই শুরু করতে না দেওয়া। এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই অতএব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Mutually Assured Destruction, সংক্ষেপে MAD।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তাদের সঙ্গী রাষ্ট্রগুলিই সমরসম্ভার উৎপাদন ও তা রপ্তানীর অধিকাংশ ভাগটা দখল করে আছে। অবশ্য প্রায় প্রতিটি উন্নতিকামী রাষ্ট্রই আজ সমরসম্ভার উৎপাদন এবং সামরিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনার খাতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সূচক হিসেবে সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা একালের রেওয়াজ।

পুরাতন দ্বন্দ্ব, সীমান্তবিরোধ, জাতিগত সংঘাত ইত্যাদিও তৃতীয় বিশ্বের উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তৃতীয় দুনিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সশস্ত্র সংঘর্ষের মঞ্চ। এবং এই সংঘর্ষগুলি সংঘটিত হয় উন্নত দেশগুলি থেকে আমদানি করা সমরাস্ত্রের সাহায্যে। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যেকার এই সংঘর্ষগুলি থেকে সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে পারস্পরিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা। দৃষ্টান্ত ঃ ভারত—পাকিস্তান, ইরান—ইরাক, আরব—ইজরায়েল, থাইল্যান্ড—কাম্পুচিয়া ইত্যাদি। বৃহৎ শক্তিগুলি শুধু অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি করেই এই যুদ্ধে মদত দেয় নি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনের দ্বারা এর ইন্ধন জুগিয়েছে। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই সামরিক ঘাঁটির ও সামরিক জোটের অদ্ভুত শৃঙ্খল গড়ে তুলেছে চারিদিকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এইভাবে দাতা-গ্রহীতার এক জটিল ছক তৈরি হয়ে উঠেছে। আর এইসব সুনিপুণ সমরাস্ত্র সমূহ আবিষ্কৃত হবার ফলে মানবসমাজ ক্রমাগত এগিয়ে ছলেছে সামরিকীকরণের দিকে। ফলে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে সামরিক বিধিব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এই দিক থেকে বৃহৎশক্তি সমূহের মধ্যেকার অস্ত্র প্রতিযোগিতা এক বিশ্বব্যাপী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৩২.৪ শক্তি আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা

পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের বিপদ ও অস্ত্রশিল্পের অগ্রগতির ফলে উন্নত দেশসমূহে যে গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপদ ঘনিয়ে উঠছে তাতে জনমানসে বিশ্বশান্তি বিষয়ে এক সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রকাশ ঘটেছে বিশ্বের নানা দেশে বিভিন্ন ধারার শান্তি আন্দোলনের মধ্যে।

৩২.৪.১ পশ্চিমী দেশে শান্তি আন্দোলন

অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও গ্রন্থ ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় যাতে এ বিষয়ে ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। Club of Rome-য়ের 'Limits to Growth', ব্রিটেনের 'Blueprint for Survival' এবং E. F. Schumacher-য়ের 'Small is Beautiful' হল এই রকম কয়েকটি নজির। কিন্তু এসবের আগেও ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Campaign for Nuclear Disarmament (CND) বার্টান্ড রাসেল প্রদর্শিত পথে। অবশ্য ১৯৭০ ও ৮০'র দশকের শান্তি আন্দোলনের ব্যাপ্তি অনেক বেশি।

সাম্প্রতিককালে শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে Green Movement (সবুজ আন্দোলন) সামিল হওয়ায় এটি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রধানত চারটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে ঃ পরিবেশ সামাজিক দায়িত্ব চেতনা, তৃণমূল গণতন্ত্র ও অহিংসা।

অনিয়ন্ত্রিত শিল্পাঞ্চল বিস্তার শিল্পদূষণ সৃষ্টি করেছে, প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ ঘটিয়েছে, ধ্বংসসাধন করেছে ভূমন্ডলের এবং সম্পদের অসম বন্টনকে বৃদ্ধি করেছে। অম্লবর্ষণ (Acidrain), বৃক্ষরাজির বিনাশ, নদী ও সাগরজলের বিষাক্তকরণ এবং বায়ুমন্ডলের দূষণ ইত্যাদি হ'ল পরিবেশ দূষণের কয়েকটি দিক। এই জাতীয় দূষণের ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থাগুলির এক বড় ভূমিকা বর্তমান। অন্যান্য সব বিবেচনাকে বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকে একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে অনুসরণ করে এইসব বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থা। এইসব বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা বিপুল সম্পদের অধিকারী যা কোন কোন ছোট রাষ্ট্রের সম্পদের তুলনায় বেশি, এবং এই সব সংস্থা ছড়িয়ে আছে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে নানা দেশে। ভূপালে অবস্থিত ইউনিয়ন কার্বাইড-এর আকস্মিক দুর্ঘটনায় কয়েক সহস্র মানুষের প্রাণহানি এর এক জ্বলন্ত নজীর। শান্তি আন্দোলন তাই উন্নয়নের ধারণাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে চায় এবং উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক বিকাশকেই বিকল্প মডেল বা পথ হিসেবে তুলে ধরা হয়।

জাতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধার রাজনীতিবিদদের চিন্তাধারা আজও নিয়ন্ত্রিত হয় যে যুক্তি অনুযায়ী তা হল, শান্তি আসবে নিরাপত্তার মাধ্যমে এবং নিরাপত্তা আসবে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রসমূহের মনে অস্ত্রের ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে। অন্যদিকে শান্তি আন্দোলন জোর দেয় বিশ্বের জনগণের দ্বারা সংগঠিত গণ আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর—যেমন Amnesty International অথবা Campaign for Nuclear Disarmament. অহিংস, সামরিক জোটের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি এবং জনগণ ও জাতিগোষ্ঠী সমূহের মধ্যে পারস্পরিক মিত্রতা—এসবের মধ্যেই প্রকৃত শান্তির আশ্বাস নিহিত আছে, সামরিক ব্যবস্থাপনার সাহায্যে গড়ে তোলা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নয়। তাই শক্তির উৎস হিসেবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের চেয়ে পারমাণবিক অস্ত্রের বিরোধিতা ও নিরস্ত্রীকরণকেই শান্তি আন্দোলন অধিক গুরুত্ব দেয়। অহিংস প্রতিরোধের ধারণাকেই তারা সমর্থন করে।

উপরন্তু এই শান্তি আন্দোলন মেয়েদের অধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি আন্দোলন তৃতীয় বিশ্বের প্রয়াসকে সমর্থন করে যার দ্বারা বিশ্বে নতুন অর্থনৈতিক বিন্যাস সূচিত হতে পারে। এই নতুন ব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর থেকে অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটবে।

৩২.৪.২ যুদ্ধ প্রসঙ্গে গান্ধীর মত

১৯২০ ও ৩০-এর দশকে গান্ধীজী যেসব মত ব্যক্ত করেছিলেন উপরোক্ত শান্তি আন্দোলনের মতামতের সাথে তা নানা দিক থেকে মিলে যায়। তিনি হিংসার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথকে বাতিল করেছিলেন, এবং সত্যাগ্রহ ও গণপ্রতিরোধ (Civil resistance) গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন 'আক্রমণ বা আত্মরক্ষা যে প্রয়োজনেই হোক সকল হিংসাই জীবন ও সম্পত্তির বিনাশ সাধন করে।' তিনি এমন কী একতরফা নিরস্ত্রীকরণের কথাও বলেছেন।

গান্ধী মনে করতেন প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া এবং প্রকতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ জীবনযাপন করাই হ'ল অহিংসা। বৃহদায়তন শিল্প ও কলকারখানার প্রতি তাঁর বিরোধিতাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে অহিংসা সম্পর্কিত তার উপরোক্ত ধারণাকে অনুধাবন করতে হবে। তিনি ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ ও গ্রামসমাজের স্বশাসনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। এর দ্বারা কেবল তৃণমূলস্তরের গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হবে না, নতুন মানুষও গড়ে উঠবে। তাই একালের এই নতুন শান্তি আন্দোলন নানা দিক থেকে গান্ধীর মতামতকেই প্রতিফলিত করছে।

গান্ধীজী যুদ্ধ ও হিংসার অসারতা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'যুদ্ধ সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে যুদ্ধ কৌশলকে সমৃদ্ধ করার মধ্যে নয়, শান্তি বজায় রাখার কৌশলকে বিকশিত করার মধ্যে।' তিনি নিরপেক্ষতাকে সমর্থন করতেন না বরং মনে করতেন যে এক শান্তিবাদীর নৈতিক দায়িত্ব হ'ল কোন সামরিক সংঘাতে কোন পক্ষ ন্যায়ের দিকে তা নির্ণয় করা। তাঁর পক্ষে সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় ছিল যুদ্ধাস্ত্র ও হিংসার প্রয়োগ। যে কোন যুদ্ধকেই তিনি প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে 'যুদ্ধ হ'ল অন্যায়,—এক স্থায়ী অকল্যাণ—এর অবসান ঘটাতেই হবে—রক্তপাত বা প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নয়।'

যুদ্ধের বদলে গান্ধী অহিংস গণ আন্দোলনের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মত 'হিংসার প্রত্যক্ষ প্রকাশ হিসেবে যুদ্ধাস্ত্রের একমাত্র প্রতিষেধক হ'ল সত্যাগ্রহ'—যা অহিংসার প্রত্যক্ষ প্রকাশ। এমনটা হতে পারে যে অহিংস প্রতিরোধের কালে সকল প্রতিরোধকারীই প্রাণ হারাবেন, তবু তিনি বিশ্বাস করতেন যে আক্রমণকারী যথাসময়ে অহিংসার প্রতিরোধকারীদের হত্যা করতে শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। আক্রমণকারী এদের মনোবলের উৎসকে খুঁজতে চেষ্টা করবে এবং অতিরিক্ত হত্যা থেকে বিরত হবে।

অনুশীলনী ১

দ্রষ্টব্য ঃ উত্তরের জন্য নীচের খালি জায়গাটি ব্যবহার করুন।
একেকের শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিন।

১। বিশ্ব সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। শান্তি ও অহিংসা বিষয়ে গান্ধীর মতামত সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩২.৫ সারাংশ

জাপানে বিধ্বংসী বিস্ফোরণ মৃত মানুষের যে মহাশ্মশান সৃষ্টি করেছিল তা বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দিয়েছে। এবং পারমাণবিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ধারাবাহিক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্বের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পারমাণবিক বিস্ফোরণের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া খুব কম করে বললেও বলতে হয় একটি দুঃস্বপ্নের মত। সর্বনাশের এই সম্ভাবনা সত্ত্বেও বৃহৎ শক্তিবর্গ ও তাদের সঙ্গীদের এই পারমাণবিক শক্তি বিস্তারের নীতি তাদের অভ্যন্তরীণ জীবনেও সঙ্কট ঘনিয়ে তুলতে বাধ্য যেমন বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সেবার উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি। এর প্রতিক্রিয়া থেকে রেহাই পাবে না উন্নয়নশীল দেশগুলিও—যারা নিজেদের ভূখণ্ডগত সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে মাথা ঘামায়। অনিবার্য ভাবেই তারা তাদের অপ্রতুল সম্পদ সমারিক খাতেই ব্যয় করে চলেছে; স্বভাবতই অবহেলিত হচ্ছে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী। এরই ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছে যা এইসব দেশের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর।

সম্প্রতিককালে অবশ্য এই বৃহৎ শক্তিবর্গ পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তারের উন্মত্ত প্রতিযোগিতার অসারতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে পারমাণবিক শক্তির দেশগুলি নিজেদের মধ্যে Non-Proliferation Treaty সম্পাদন করেছে। পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির ওপর নির্জোট দেশসমূহের যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। এই প্রভাবের দরুন পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত হ্রাস করার জন্য—ভূগর্ভ, মহাশূন্যে, সমুদ্রগর্ভে ও অন্যত্র—কতকগুলি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। রোনাল্ড রেগন ও মিখাইল গর্বাচভের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিজেদের সেনা প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় তা বিশ্বশান্তির পক্ষে এক স্বাস্থ্যকর ইঙ্গিত। ঠাণ্ডা-লড়াই যা অতীতে ভয়ঙ্কর মাত্রা অর্জন করেছিল ক্রমশই তার উত্তেজনা প্রশমতি হচ্ছে। নিজেদের অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে সামরিক শক্তিকে যে মূল গুরুত্বের স্থান দিয়ে এসেছে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি এতকালে তা ক্রমশই গুরুত্ব হারাচ্ছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে শান্তি ক্রমশই মৌলিক গুরুত্ব লাভ করছে।

অতএব বিশ্বশান্তি আন্দোলন বিশ্বের নানা দেশে আজ তাৎক্ষণিক ও বর্ধিত তাৎপর্য অর্জন করছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাও আজ এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার গুরুত্ব অনুধাবন করছে। কেবলমাত্র একটি জোরদার আন্দোলনই পারে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে।

৩২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

Burzan Barry, 1983	People States and Fear : The National Security Problem in International Relations, Harvester Press, Sussex.
Catudal, H.M. 1983	Nuclear Deterrence. Does it deter? Marshall Pub. Ltd. New York (Chap 1).
Clarke, Duncan L, 1985	Politics of Arms Control : The Role and effectiveness of the US Arms Control and Disarmament Agency. The Free Press, London (chap 2).
Howe O Connor J (ed) 1984	Armed Peace : The search for world security, Macmillan, London.
Pasolini A and Robert J, 1984	The Arms Race as a time of Decision. The Macmilan Press, London.
T. T. Poulose (ed.) 1988	The Future of Arms Control, ABC Pub., New Delhi.
	United Nations and Nuclear Proliferation DK Pubs. New Delhi.

একক ৩৩ □ বাস্তুতন্ত্র (Eco-System) ও তার বিপদসমূহ

৩৩.১ উদ্দেশ্য

৩৩.২ প্রস্তাবনা

৩৩.৩ বাস্তুতন্ত্র কী ?

৩৩.৩.১ সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

৩৩.৩.২ বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব

৩৩.৪ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কট

৩৩.৫ বায়ুমণ্ডল

৩৩.৫.১ গুরুত্ব

৩৩.৫.২ বায়ুমণ্ডলের অপব্যবহার

৩৩.৬ পরিবেশগত অবক্ষয়

৩৩.৬.১ অবক্ষয় বনাম দূষণ

৩৩.৬.২ উষরীভবন ও উষরীকরণ

৩৩.৬.৩ বিনষ্টির বিধান (Entropy Law)

৩৩.৭ বর্তমান বিপদসমূহ

৩৩.৮ সারাংশ

৩৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৩.১০ উত্তর সংকেত

৩৩.১ উদ্দেশ্য

বাস্তুতন্ত্রের উপর এই অংশটুকু পড়ার পর আপনি পারবেন ঃ

বাস্তুতন্ত্র ও তার গুরুত্ব বর্ণনা করতে।

বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কটের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে।

বাস্তুতন্ত্রের বর্তমান বিপদের আলোচনা করতে ও তার শোধরানোর উপায় নির্দেশ করতে।

৩৩.২ প্রস্তাবনা

বাস্তুতন্ত্রের অর্থ কী? বাস্তুতন্ত্র বলতে আসলে জীবজগতের সাথে তার পরিবেশের সম্পর্ককে বোঝায়। এই সম্পর্ক বিচিত্র ও পারস্পরিক। দুর্ভাগ্যবশত সাম্প্রতিককালে এই সম্পর্ক নিদারুণভাবে বিপন্ন হচ্ছে। 'বাস্তুতন্ত্রগত সঙ্কট', 'পরিবেশ দূষণ' ইত্যাদি কথাগুলির মধ্যে এই বিপন্নতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তী অংশে এ বিষয়ে আরো অনেক কিছুই পড়া হবে।

৩৩.৩ বাস্তুতন্ত্র কী ?

পৃথিবী বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীকুলের বাসভূমি। এটা এক প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য। তবু এ সত্যটিকেই যত জোর দিয়ে সম্ভব তুলে ধরলেই আমরা ভাল করব। কারণ সর্বত্র এই বাসভূমির অপব্যাবহার ও নিঃশেষীকরণ এমনভাবে ঘটে চলেছে যা অদূর ভবিষ্যতে তা বসবাসের অযোগ্য হয়ে দাঁড়াবে। এমনটা যদি ঘটে তবে আমরা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। বস্তুত আমরা ততদিনই টিকবো যতদিন এই পৃথিবী আমাদের টিকিয়ে রাখতে পারবে।

৩৩.৩.১ সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

এক পৃথ্বি চেতনা (Earth Consciousness) গড়ে তুলতে পারলে আমরা ভাল করব। আমাদের ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তুতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করা বোধহয় আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাস্তুতন্ত্র বা তার ইংরেজী প্রতিশব্দ Ecology কথাটি দুটি মূল গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে—'Oikas' যার অর্থ গৃহ, এবং 'Logos' যার অর্থ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা। অতএব প্রতিবেশবিদ্যা বলতে বোঝায় এমন এক আলোচনা শাস্ত্র যা মানুষ জাতীয় প্রাণীকুলের বসবাসব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা করে। Shorter Oxford English Dictionary-তে Ecology'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে 'জীববিদ্যার এমন এক শাখা যা পরিবেশের সাথে প্রাণীকুলের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এটা অবশ্য ঐ অভিধানে দেওয়া দুটি সংজ্ঞার মধ্যে প্রথমটি। অন্যটিতে সকল পারস্পরিক সম্পর্কের সমষ্টিকেই বোঝানো হয়েছে, এদিক থেকে প্রতিবেশবিদ্যায় সমগ্র বিশ্বের বাস্তুতন্ত্র বোঝানো হয়।

৩৩.৩.২ বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব

আমরা দেখেছি বাস্তুতন্ত্ররীতি প্রাণীকুল ও তাদের পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করে। আমরা এও দেখেছি যে এই সম্পর্ক পারস্পরিক এবং আশ্চর্যভাবে বিন্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে এই সম্পর্কের মধ্যে একটা ভারসাম্য বর্তমান। আমরা যখন বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কটের কথা বলি তখন আমরা প্রাণীকুলের সাথে তার পরিপার্শ্বের স্বাভাবিক ভারসাম্যের সেই বিঘ্নের কথাই বলি যা মানুষের কর্মকাণ্ডের ফল। প্রাণীকুলের শ্রেষ্ঠ প্রজাতি হয়েও মানুষ এই ভারসাম্যকে নির্বিচারে বিপন্ন করে তুলেছে।

অনুশীলনী ১

দ্রষ্টব্য ঃ ১) উত্তরের জন্য নীচের খালি জায়গাটি ব্যবহার করুন।

২) এই অংশের শেষে যে উত্তরের প্রতিলিপি আছে তার সঙ্গে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। বাস্তুতন্ত্ররীতির ধারণাটি সম্পর্কে পড়েছেন। ৫ লাইনে বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন ঃ

৩৩.৪ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কট

আমরা যখন বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কটের কথা বলি তখন বাস্তুতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের কথাই বোঝাতে চাই। এই সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছে মূলত পরিবেশের উপর মানুষের ক্ষয়সাধনকারী কর্মকাণ্ড ও বেআইনী হস্তক্ষেপের দরুন। এটা সহজেই বোঝা যায় যে বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থার সংহতি আমাদের নিজেদের স্বার্থেই বজায় রাখতে হবে, কারণ এই ব্যবস্থা এতই স্পর্শকাতর যে আপাতভাবে পরিবেশের কোন আঞ্চলিক অপব্যবহারও সামগ্রিক ভাঙনের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

সাম্প্রতিক বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কটের নমুনা ঃ

দুটি সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট হবে, অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কটের সুসংহত ছবি স্পষ্টতর হবে। এর প্রথমটি হ'ল কীটনাশক ও রাসায়নিক বিষের ব্যবহার যা উদ্ভিদের দেহে কীটগুলিকে ধ্বংস করতে প্রয়োগ করা হয়। এতে শেষ পর্যন্ত পোকামাকড়গুলি ধ্বংস হয় এবং কৃষিউৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এটি অত্যন্ত স্বল্পকালীন এক লাভ; কারণ ক্রমশ পোকামাকড়রা এইসব বিষের বিরুদ্ধে নিজেদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলত এইসব বিষাক্ত কীটনাশকগুলি আরো শক্তিশালী সংস্করণ আরো অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। এইভাবে সৃষ্টি হয় এক দুষ্ট আবর্তনের (Vicious Circle) ক্রিয়া। এর ফল হ'ল কৃষিউৎপাদনকে অব্যাহত রাখতে বিষ প্রয়োগের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে হবে।

আর একটি অসুবিধাও আছে। সেটি হ'ল একবার ব্যবহৃত হলে ঐসব কীটনাশক বিশেষ রোগসঞ্চারী বিষে পরিণত হয়। তারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ এইসব রাসায়নিক পদার্থগুলিকে বিনষ্ট করা বা তাদের ক্ষতিকারিতা কমিয়ে দেবার মত কোন এনজাইম ভূব্যবস্থায় তৈরি হতে পারে না। একবার ব্যবহৃত হ'লে তারা চিরকালের জন্য টিকে থাকে এবং প্রাণসম্পন্ন পদার্থের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্তনদায়িনী মায়েদের দুধে কীটনাশকের অবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি পেঙ্গুইনদের শরীরেও অনুরূপ

অবশেষ পাওয়া গেছে। অনুরূপভাবে British Nuclear Fuels Ltd. পারমাণবিক শক্তি কারখানা থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়ও ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বর্জ্যপদার্থ আইরিশ সাগর থেকে বাল্টিক সাগরের দিকে বয়ে চলেছে বলে জানা গেছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত 'Greenhouse Effect' নামে পরিচিত। এটি 'সবুজ গৃহ' বা 'উষ্ণ গৃহ' নামেও পরিচিত। এটি হ'ল এমন একটি দালানবাড়ি যার ছাদ ও দেওয়ালগুলো চাঁদ দিয়ে তৈরি। এই বাড়ি ব্যবহার করা হয় এমন সব গাছ ও ফুল ফলাতে যার জন্য সাধারণ গাছগাছড়ার চাইতে বেশি উষ্ণতার প্রয়োজন। এই সবুজগৃহ ভেদ করে যে সূর্যালোক ঢোকে তার সাহায্যে গাছেরা কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। কিন্তু এই গ্যাস সবুজ গৃহের মধ্যে আটকে থাকে এবং বাইরের থেকে আসার সূর্যের তাপকে শোষণ করে নেয়। এইভাবে সবুজ গৃহে ভেতরকার তাপকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি যথেষ্ট কাজে লাগানো যায়।

এই জাতীয় ব্যবস্থা সারা বিশ্বেই কার্যকর করা যেতে পারে। যদিও আবহাওয়ামন্ডলে মোট গ্যাসের মাত্র ০.০৩ শতাংশ হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড তবু এই গ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে এর ভূপৃষ্ঠে প্রাণীর জীবনধারণকে সম্ভব করে তোলে। এটা সহজেই বোঝা যায়। সৌরশক্তি যখন ভূপৃষ্ঠের আবহাওয়ামন্ডলের সংস্পর্শে আসে তখন তার অনেকটাই ফিরে যায়, কিন্তু কিছু বায়ুমডলের কিছু অংশের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নেয়। এইভাবে ভূপৃষ্ঠ যথেষ্ট উষ্ণ হয়ে প্রাণীকুলের জীবনধারণের উপযোগী হয়।

কিন্তু বর্তমানে বিপজ্জনক কিছু ব্যাপারস্যাপার ঘটছে। কয়লা অথবা খনিজ তেলের মত জীবাশ্ম তাপশক্তি (Fssil fuel) যত বেশি বেশি করে মানুষ পোড়াচ্ছে নানা প্রয়োজনে ততই এইসব জীবাশ্মের মধ্যে লক্ষ বছর আটকে থাকা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়া পেয়ে বায়ুমন্ডলের সঙ্গে মিশছে। ক্রান্তীয় বনাঞ্চল যেভাবে পুড়ে ছাই হচ্ছে তার ফলেও এই প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে ১৮৫০ সালে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতি মিলিয়নে এই গ্যাস ছিল ২৬৫ অংশ, অথচ বর্তমানে এই অংশ ৩৪০-তে দাঁড়িয়েছে এবং যদি ভবিষ্যতে এই বৃদ্ধিকে রোখা না যায় পরবর্তী শতাব্দীর মাঝামাঝি এই অংশ ৬০০-তে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। ফলে পৃথিবী এখনকার তুলনায় অনেক বেশি উষ্ণ হয়ে উঠবে। বস্তুত মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে যেতে পারে ফলে মেরু অঞ্চলের তুষারবরণ (Ice Cap) গলে গিয়ে পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের জলস্তরকে প্রায় ৫ থেকে ৭ মিটার পর্যন্ত অধিক উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এর পরিণতি হলো পৃথিবীর ভূভাগের বৃহদাংশ প্লাবিত হয়ে যাবে এবং চিরকালের মত নিমজ্জিত হয়ে থাকবে। কলকাতা, বোম্বাই, লন্ডন, নিউইয়র্ক ইত্যাদির মত বিশ্বের বড় বড় শহরগুলি এভাবে নিশ্চহ্ন হয়ে যাবে।

এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ বলে স্বীকৃত হচ্ছে। অতএব আমরা যদি এ ব্যাপারে সজাগ হতে শুরু করি, আমরা এই বর্তমান সভ্যতার যৌক্তিকতা বিষয়ে প্রশ্ন না করে পারি না। কারণ যেভাবে এই বর্তমান সভ্যতার জীবনধারা বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে তুলেছে তা মানবীয় অস্তিত্বের ভিত্তি নির্মূল করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর অর্থ, আমরা উন্নয়ন ও বিকাশ, উন্নয়ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন তত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সযত্নে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য।

অনুশীলনী ২

দ্রষ্টব্য ঃ উত্তরের জন্য নীচের খালি জায়গাটি ব্যবহার করুন। ৫০টি শব্দে উত্তর লিখুন।

(ক) 'বাস্তুরীতির সঙ্কট' বলতে কী বোঝায়?

(খ) আমাদের একালের বাস্তুধারার বিপদগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩৩.৫ প্রাণমণ্ডল বা জীবমণ্ডল (Biosphere)

উপরে যে পুনর্বিবেচনার কথা বলা হ'ল তার প্রয়োজন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি আমরা শুধুমাত্র পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়াও সমগ্র প্রাণমণ্ডলের কথা চিন্তা করি। আপনারা হয়তো জানেন যে এই প্রাণমণ্ডল বলতে বোঝায় পৃথিবীকে বেষ্টন করে থাকা প্রাণের এমন এক পরিমণ্ডল যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় বায়ুমণ্ডল, সমুদ্রভাগ ও ভূভাগ—যার প্রত্যেকটিতেই আছে অসংখ্য প্রকার প্রাণের সম্ভার।

এই অসংখ্য প্রকার প্রাণীর মত আমরাও এই প্রাণমন্ডলের এক অতি নিবিড় অংশ। কিন্তু অন্যান্যরা যা পারে না আমরা তা পারি, এবং তা হলো আমাদের কর্মধারার সাহায্যে আমরা এই প্রাণমন্ডলের রূপান্তর সাধন করতে পারি। এর অর্থ, অন্যান্য প্রাণীদের মতই আমরা এই প্রাণমন্ডলের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ এবং সেখান থেকেই আমাদের বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করি, অথচ অন্যান্য প্রাণীদের মত ঐ প্রাণমন্ডলের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সংযুক্ত নই।

৩৩.৫.১ গুরুত্ব

এটা স্মরণে রাখাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে অধুনা এই প্রাণমন্ডল সামগ্রিকভাবে একটি অখন্ড জীবনধারা হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে অথবা একে তুলনা করা যেতে পারে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবদেহের সাথে। অতএব আমরা যদি এই প্রাণমন্ডলের দূষণপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখি আমরা এই দূষণ জনিত ক্ষয়ক্ষতির ফলভোগ করতে এবং বিনাশসম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করতে বাধ্য।

এক প্রাণময় জীবসত্তা রূপে প্রাণমন্ডলের যে ধারনা তার উৎসসন্ধানে ফিরে যেতে হয় একালের এক প্রখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী অধ্যাপক James Lovelock-য়ের কাছে। তিনি একে অভিহিত করতে দুটি শব্দের ব্যবহার করেছেন

যার একটি হ'ল Gaia এবং অন্যটি 'Geo'। এই দুটি হ'ল গ্রীক পুরাণে পৃথিবী দেবীর নাম, এবং এই দ্বিতীয় শব্দটি থেকেই Geometry, Geography, Geology ইত্যাদি ইংরাজি শব্দগুলির উৎপত্তি।

অধ্যাপক Lovelock আরও বলেছেন যে এই Gaia অথবা বিশ্ব প্রাণমন্ডলের নিজেকে সৃষ্টি করার নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা আছে, কোন প্রজাতির তা নেই। বস্তুতপক্ষে অনেক প্রজাতিই ইতিমধ্যে সৃষ্ট হয়েছে এবং বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর এই দিক থেকে অন্তত আমরা অন্য প্রজাতি থেকে ভিন্ন নই। তবু অন্যান্য প্রজাতির পরিস্থিতির চেয়ে আমাদের পরিস্থিতি ভিন্ন। কারণ অন্যান্য প্রজাতির প্রাণী যে পরিস্থিতিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু আমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে সেটা আমাদেরই তৈরি এক অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

৩৩.৫.২ প্রাণমন্ডলের (বা জীবমন্ডলের) অপব্যবহার

মনুষ্য-সৃষ্ট ধ্বংসের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল আবর্জনাবাহী নর্দমার মত জীবমন্ডলের ধারাবাহিক অপব্যবহার। সমস্ত ধরনের কলকারখানার বর্জ্যপদার্থ, সকল প্রকার যন্ত্রযান থেকে উদগীর্ণ ধোঁয়া, কৃষিতে ব্যবহার্য রাসায়নিক পদার্থ, আণবিক পরীক্ষাদি থেকে উদ্ভুত বিষবাষ্প এবং সামরিক অনুশীলনের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নানা দিক থেকে জীবমন্ডলে প্রবেশ করে, যেহেতু এগুলি অন্য কোথাও যেতে পারে না। হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রতি বছরে প্রায় ২০,০০০ মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ১৩০ মিলিয়ন টন সালফার-ডাই-অক্সাইড, ৯৭ মিলিয়ন টন হাইড্রোকার্বন, ৫৩ মিলিয়ন টন নাইট্রোজেন অক্সাইড, ৩ মিলিয়ন টনের বেশি আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, সিসে, পারদ ইত্যাদি আবহাওয়া মন্ডলে মিশছে। এর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে আরো বেশ কিছু সংশোষিত জৈব যৌগ বা ক্যান্সার, জন্মকালীন বিকার ও জেনেটিক পরিবর্তন সঞ্চারিত করে। সালফার-ডাই-অক্সাইড এবং নানা প্রকার নাইট্রোজেন অক্সাইড বায়ুমন্ডলের জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এর থেকেই সৃষ্টি হয় অ্যাসিড বা অম্লজনিত নানা দুর্যোগের সূচনা যেমন অম্ল বর্ষণ, অম্লতুষার, অম্লতুষারঝড়, অম্লকুয়াশা, অম্লশিশির ইত্যাদি উপসর্গ। স্বাভাবিকভাবেই এইসব উপসর্গগুলিকে 'রাসায়নিক কুষ্ঠ' রোগ বলে অভিহিত করা হচ্ছে। যা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা জুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবেই এক বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সঙ্কট, প্রধানত দুটি কারণে — ১) অতি উন্নত দেশগুলিতে নিষ্ক্রিয় বিষাক্ত পদার্থ ঐসব দেশের পরিধির মধ্যে সীমিত থাকে না; এবং ২) অর্ধোন্নত দেশগুলি জীবাশ্ম-তাপশক্তি (ইন্ধন!)-র বহুল ব্যবহার ঘটায়।

এসবের মোদ্দা অর্থ হ'ল আমরা পৃথিবীকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলতে, বা হয়তো ইতিমধ্যে অযোগ্য করে তুলেছি। যাই হোক, আমরা এই বাস্তুতন্ত্র ও জীবমন্ডলের সংহতি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা আজও যথাযথ উপলব্ধি করতে পারিনি। এই জন্যেই পরিবেশকে রূপান্তরিত করার আমাদের বিশেষ ক্ষমতা যা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীপ্রজাতি থেকে আমাদের উন্নত করেছে এবং আমাদের মনুষ্যত্বদান করেছে তা আজ আমাদের ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি বহন করে আনছে।

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ পারমাণবিক মহাশ্মশানের মত এত ভয়াবহ সম্ভাবনা নয়। তবু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে এই বিপজ্জনক সম্ভাবনা বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকা উচিত। এর গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। কারণ জীবমন্ডল হ'ল এক জটিল বিন্যাস যার মধ্যে শতসহস্র প্রজাতির প্রাণী নানান বিচিত্র সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ। একটি দুটি প্রজাতির বিলোপে এই বিন্যাস অব্যাহত থাকতে পারে। অর্থাৎ, কয়েকটি মাত্র প্রজাতির অপসারণ বা বিনাশে Gaia ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না বা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

কিন্তু আজ আমরা যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি তা শুধু কয়েকটি প্রজাতির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নয়, বরং ব্যাপক হারে বহু প্রাণী প্রজাতির বিলোপের আশঙ্কা। এই পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির জন্যে যে সম্ভাব্যতার কথা মাথায় রাখতে হবে তা হল ২০০০ সালের মধ্যে আধ মিলিয়ন থেকে দু মিলিয়ন প্রজাতি — অর্থাৎ পৃথিবীর মোট প্রাণী প্রজাতির ১৫ থেকে ২০ শতাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর এটা ঘটবে অংশত এই কারণে যে পৃথিবীর বনাঞ্চল হ্রাস পাচ্ছে, এবং মুখ্যত এই কারণে যে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ক্রমবর্ধমান দূষণ প্রক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। প্রাণী জগতের এই প্রকার বিলোপসাধন ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি। একারণে আমরা আমাদের এই সময়কে 'বিলুপ্তির যুগ' বা 'Age of Extinction' বলে বর্ণনা করতে পারি।

অনুশীলনী ৩

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি মন দিয়ে পড়ুন এবং সঠিক উত্তরটি দাগ দিন। (এই অংশের শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে দেখুন)

১। জীবমন্ডল বলতে বোঝায়

(ক) আবহাওয়ামন্ডল, সমুদ্রভাগ ও মৃত্তিকা।

(খ) আবহাওয়ামন্ডল ও সমুদ্রভাগ।

(গ) সমুদ্রভাগ ও মৃত্তিকা।

২। বর্তমানে জীবমন্ডলকে দেখা হয়

(ক) একক জৈব-ব্যবস্থা হিসেবে।

(খ) বহুবাদী জৈব-ব্যবস্থা হিসেবে।

(গ) এক অজৈব ব্যবস্থা হিসেবে।

৩। একক জৈব-ব্যবস্থার ধারণার উদ্গাতা

(ক) অধ্যাপক জেমস লাভলক।

(খ) অধ্যাপক অল্ডাস হাক্সলি।

(গ) অধ্যাপক জে. বি. হ্যালডেন।

৩৩.৬ পরিবেশগত অবক্ষয়

পরিবেশগত অবক্ষয় আমাদের কাছে গভীর উদ্বেগের কারণ। সারা পৃথিবীর যে পার্থিব পরিমন্ডল তা মানুষের ভোগবাদী বিকাশমূলক কর্মকান্ডের দ্বারা বিপন্ন হয়েছে। কলকারখানার বর্জ্যপদার্থ, রাসায়নিক পদার্থ, বিষাক্ত গ্যাস — আধুনিক মানুষের যাবতীয় উদ্ভাবন — আমাদের পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। একথাও অবশ্য স্মরণে রাখা দরকার যে সকল পরিবেশগত অবক্ষয় মনুষ্যসৃষ্ট কারণে ঘটে না। স্বাভাবিক গতিতে প্রকৃতির যে ক্ষয়সাধিত হয় তার সাথে মনুষ্যসৃষ্ট ক্ষয়সাধনের মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। এটাও উপলব্ধি করা দরকার যে কিছু অবক্ষয় স্বাভাবিক ও অনিবার্য এবং এব্যাপারে আমাদের কিছুই করণীয় নেই।

এ ব্যাপারটাকে জীবনের এক অনিবার্য ধারা হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। এর অর্থ, যদি আমাদের এই মানবপ্রজাতি আদৌ না থাকত, তবুও এই বিশ্বজোড়া বাস্তুতন্ত্রের ক্ষয়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকত

আমাদের ছাড়াই। অন্যভাবে বলা যায়, পৃথিবীর বুকে মানুষের উদ্ভবের বহু আগে থেকেই এই ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল, এবং মানুষ বিলুপ্ত হবার পরেও এই ধারা চলতে থাকবে।

৩৩.৬.১ অবক্ষয় বনাম দূষণ

পরিবেশগত ক্ষয়ীভবন ও পরিবেশ দূষণের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা সহজ। ক্ষয়ীভবন প্রায় বয়োবৃদ্ধির মত। কিন্তু দূষণ হলো ফুসফুসের ক্যান্সারের মত যা ধূমপানের ফলে ধূমপায়ীকে আক্রামণ করে ও তার জীবনকালকে সংক্ষিপ্ত করে তোলে। এর অর্থ, দূষণ হলো এমন প্রক্রিয়া যা পরিবেশের স্বাভাবিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে তোলে। সহজেই বোঝা যায়, আমাদের পরিবেশ যদি স্বাভাবিক অবক্ষয়ের হাত থেকে মুক্ত থাকতো তবে তা দূষণ এর হাত থেকেও মুক্ত থাকতো। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি জীবনের এক স্বাভাবিক ধারা, এবং পরিবেশের অবক্ষয়ও ঠিক তাই। বাস্তবিকই, আমরা পরে দেখবো, এই ক্ষয়ীভবনের ফলেই পৃথিবীতে জীবনের সূচনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দূষণ হলো পৃথিবীর জীবন-সহায়ক ব্যবস্থার ক্রমিক বিনাশ, এবং বিগত প্রায় ৫০ বছর ধরে এই দূষণ প্রক্রিয়া চরম ও ক্রমবর্ধমানভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। অতএব আমাদের যা করা উচিত তা হ'ল পার্থিব পরিবেশের অবক্ষয়কে ঠেকানোর চেষ্টা করা যদিও সেটা সম্পূর্ণ থামানো আমাদের সাধ্যাতীত। এটাকে জগতের স্বাভাবিক ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত। আমরা শুধু পারি পরিবেশের অপব্যাবহারকে কমিয়ে আনতে।

৩৩.৬.২ উষরীভবন ও উষরীকরণ

স্বাভাবিক অবক্ষয় ও পরিবেশ দূষণের মধ্যে পার্থক্যকে আরো স্পষ্ট করে তুলতে আমরা আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে পারি মরুভূমি বা অতি শুষ্ক কোন অঞ্চলের দিকে। এই জাতীয় পাঁচটি বড় শুষ্ক মরু অঞ্চল পৃথিবীতে আছে যা নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। সাহারা, আরব ও গোবি হ'ল এদের মধ্যে প্রধান। এইসব অঞ্চল ও প্রায়-অনুর্বর ভূভাগ পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় এক-তৃতীয়ংশ। বহু শুষ্ক অঞ্চলে মরুভূমির পরিধি ভীতিপ্রদ গতিতে বেড়ে চলেছে। যখন এই বৃদ্ধি প্রাকৃতিক কারণে ঘটছে তখন তাকে বলা হয় 'উষরীভবন'। কিন্তু এই মরু অঞ্চলের বিস্তার যখন ঘটে কৃষিবিস্তার, বনবিনাশ, অতি মাত্রায় পশুচারণ বা অতি অল্প সেচের কারণে তখন এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলতে পারি 'উষরীকরণ'। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় মরুভূমির প্রসার অতি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া এবং তা ঘটে জলবায়ুগত পরিবর্তনের দরুন। উষরীভবন তাই তুলনামূলক বিচারে এক শ্লথগতি পদ্ধতি। পক্ষান্তরে উষরীকরণ এক মারাত্মকভাবে দ্রুতগতি প্রক্রিয়া। প্রতি বছর প্রায় ১২ মিলিয়ন হেক্টর ভূমি এই উষরীকরণ প্রক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে এবং কৃষির অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। এর মধ্যে প্রায় ৫ বিলিয়ন হেক্টর ভূভাগ বর্ষণসিক্ত অঞ্চল হওয়া সত্বেও তার উপরিস্তর উষর হয়ে পুড়ছে। ফলে প্রতি বছরে প্রায় ২০,০০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষতির পরিমাণের মাত্র একের আট ভাগের সাহায্যেই এই জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনা বা ক্ষতিরোধ করা যায়।

এসব সত্বেও আমরা উষরীকরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও উষরীভবনকে ঠেকাতে পারব না। এর দ্বারা আগে আমরা যে কথা উল্লেখ করেছি সেই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করণীয় থাকলেও পরিবেশের অবক্ষয় বিষয়ে আমাদের কিছু করণীয় নেই। দূষণ একটি রোগ যা আমরা নিরাময় করতে পারি। আর অবক্ষয় হলো বয়োবৃদ্ধির মত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যা আমাদের মেনে নিতে হবে।

৩৩.৬.৩ বিনষ্টির বিধান (Entropy Law)

আমাদের এই উল্লিখিত অক্ষমতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হ'ল 'Entropy Law'. বস্তুতপক্ষে, এটা হ'ল বিশ্বপ্রকৃতির এক মৌলিক সূত্র এবং এ বিষয়ে আমাদের ওয়াকিবহাল থাকা ভাল। আলবার্ট আইনস্টাইন নিজেই একে বিজ্ঞানের এক প্রাথমিক সূত্র বলে বর্ণনা করেছেন। স্যার আর্থার এডিংটন এর বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছেন এটি হ'ল সমগ্র মহাবিশ্বের এক চূড়ান্ত আধিবিদ্যক সূত্র, এবং আরো সাম্প্রতিককালে ব্যারি কমনার (Barry Commoner) একে বর্ণনা করেছেন প্রকৃতির কর্মধারা সম্পর্কে সবচেয়ে শক্তিশালী অন্তর্দৃষ্টি বলে।

এই সূত্রের বক্তব্য খুবই সরল। সমস্ত বস্তু ও শক্তিই স্বতঃস্ফূর্ত ও তাদের গতি-প্রকৃতির কোন ব্যতিক্রম নেই এবং তাই সময়ের সাথে সাথে এদের ক্ষীয়মানতা অনিবার্য। এই ক্ষীয়মানতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হ'ল সূর্য। সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ (চার) মিলিয়ন টন ভর হারাচ্ছে, এবং তার তাপশক্তির যে বিকিরণ প্রতিনিয়ত নানা দিকে ঘটছে তার এক অতি ক্ষুদ্র অংশ আমাদের পৃথিবীতে এসে জীবনের সহায়ক হয়ে ওঠে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে এই ক্ষীয়মানতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় তার গতিকে উল্টে দেওয়া। অনুরূপভাবে, যখন এক টুকরো কয়লা পুড়ে ছাইয়ে পরিণত হয় সেই ছাইকে পুনরায় কয়লায় রূপান্তরিত করা যায় না। অথবা যখন এক শিশি আতরের ছিপি খুলে দেওয়া হয় তখন শিশির ভেতরকার ঘণীকৃত তরল পদার্থের অণুগুলি ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এই অণুগুলিকে বন্দী করে পুনরায় আতরের শিশিতে পোরা যায় না।

সূর্য, এক টুকরো কয়লা এবং এক শিশি আতর এসবই সুনির্দিষ্টভাবে সুসংবদ্ধ কাঠামো (ordered structures) । এই সুসংবদ্ধ কাঠামো সম্পন্ন বস্তুগুলি নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে। ক্রমক্ষীয়মানতার প্রক্রিয়ায় এদের সুসংবদ্ধ কাঠামো বিনষ্ট হয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদনের ক্ষমতা হারায়।

মহাবিশ্বের বস্তুপঞ্জের এই সুসংবদ্ধতা থেকে অসংবদ্ধতায় রূপান্তরকে চিহ্নিত করতে যে সূচক ব্যবহার করা হয় তাকে 'Entropy' বলে। Rudolf Classius নামে এক জার্মান পদার্থবিদ ১৮৬৮ সালে এই শব্দটি উদ্ভাবন করেন। 'En' এবং 'Trope' নামক মূল দুটি গ্রীক শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে এই নতুন শব্দটি। যুক্ত এই শব্দটির দ্বারা Classius বোঝাতে চেয়েছেন 'The Transformation Content' । সাধারণভাবে, 'Entropy Law' বলতে বোঝায় যেসব প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমাদের বাঁচতে হয় এবং যেগুলিকে আমরা লঙ্ঘন করতে পারি না। আমরা যখন অপেক্ষাকৃত অসংবদ্ধ একতাল লৌহআকরিককে একখন্ড সুসংবদ্ধ লোহায় পরিণত করি এবং পরে তাকে আরো সুসংবদ্ধ একটি হাতুড়িতে রূপান্তরিত করি; তখন অবশ্যই তার মধ্যে আমরা শৃঙ্খলা বা সুসংবদ্ধতা আনি, যদিও তা শুধুমাত্র স্থানিক বা আংশিক। কিন্তু খন্ডিতক্ষেত্রে এই শৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে পারি না। সমস্ত ধরণের অট্টালিকা, রাস্তা, রেলপথ, কারখানা, তৈলশোধনাগার, মোটর গাড়ি, সাইকেল, পিন ইত্যাদি সবই হ'ল কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট শৃঙ্খলার নানা নমুনা। ভূমিক্ষয়, জলমগ্নতা, দূষিত বায়ু, অম্লবর্ষণ, দূষিত নদী ইত্যাদি হলো কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা। অন্যভাবে বলা যায়, দূষণ হল মনুষ্যসৃষ্ট Entropy.

একথার অর্থ হল যে আমরা সব নির্মাণ, উৎপাদন ও কৃষিকর্ম বন্ধ করে দেব। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই দেখতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত বিনাশ ও পরিবেশের দূষণ সৃষ্টি হয় এমন প্রয়াসে যেন আমরা বিশেষ উদ্যোগী না হই। কারণ, যদি আমরা এ ব্যাপারে যত্নবান না হই তবে আমরা নিজেদের বিনাশকেই ত্বরান্বিত করবো।

অনুশীলনী ৪

দ্রষ্টব্য ঃ ১) নীচের খালি জায়গা ব্যবহার করুন।

২) এই অংশের শেষে দেওয়া আদর্শ উত্তরের প্রতিলিপির সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নিন। পরিবেশের অবক্ষয় বলতে আপনি কী বোঝেন ব্যাখ্যা করুন। পরিবেশের দূষণের সাথে এর পার্থক্য কী?

৩৩.৭ বর্তমান বিপদসমূহ

ইতিপূর্বে যে আলোচনা করা হ'ল তা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে বর্তমানে বাস্তুতন্ত্র বিভিন্ন দিক থেকে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। উপরি-বর্ণিত আলোচনায় এইসব বিপদের কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। নীচে এইসব বিপদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'ল। মানব-প্রজাতির বয়স দু মিলিয়ন বছরই হোক অথবা ৫০ হাজার বছরই হোক, আমাদের মনে রাখা দরকার যে বিগত মাত্র ৫০ বছর বা তার কিছু বেশি সময় ধরে আমরা এক তীব্র ও চরম দূষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে বেঁচে আছি। বস্তুতপক্ষে, এই প্রথম বিশ্বজোড়া বাস্তুতন্ত্র বিপর্যয়ের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। অবশ্য এমন নয় যে জীবপ্রজাতিতে আমরাই প্রথম প্রতিবেশগতভাবে ক্ষতিকর কর্মে লিপ্ত হয়েছি। কিন্তু অতীতে আমাদের পক্ষে খুব বেশি ক্ষতিসাধন করা সম্ভব ছিল না। অন্যভাবে বলা যায় যেটুকু ক্ষতিসাধন অতীতে হতো তা পৃথিবীর ব্যাপক অঞ্চলে প্রসারিত হতো না। তাছাড়া ঐটুকু পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি শুধরে নেওয়ার ক্ষমতা প্রকৃতির ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই ক্ষতিসাধন ঘটছে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এবং এই ক্ষয়ক্ষতি নিজে থেকে শুধরে নেওয়ার ব্যাপারে পৃথিবীর ক্ষমতাও কমে এসেছে।

পৃথক পৃথক কর্মকান্ড ও বাস্তুতন্ত্রের বিপর্যয় ঃ

চার রকমের পৃথক কর্মকান্ডের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যার প্রতিটিই, সময় মতো ঠেকানো না গেলে, বিশ্বব্যাপী বাস্তুতন্ত্রকে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং একটি জীবপ্রজাতি হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। এই কর্মকান্ডগুলি হ'ল ঃ (ক) নিরক্ষীয় অরণ্যাঞ্চলের বিনাশ, (খ) পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের কর্মকান্ড, (গ) পারমাণবিক-শক্তি উৎপাদন (ঘ) সমকালীন সামরিকিবাদের বাহুল্য। এই তালিকা পরিবেশের দিক থেকে চরম বিপজ্জনক সমস্ত বা অধিকাংশ কর্মকান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। কিন্তু তবু ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার পক্ষে এই তালিকা যথেষ্ট।

(ক) নিরক্ষীয় বর্ষা-বনাঞ্চলের বিনাশ ঃ

এই বনাঞ্চল ভূ-পৃষ্ঠে বিষুবরেখা বরাবর এক প্রশস্ত সবুজ বন্ধনীর মতো যা পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় ৮ শতাংশ দখল করে আছে। তবু সারা বিশ্বে যত বৃক্ষসম্পদ আছে তার প্রায় অর্ধেক এই অঞ্চলেই জন্মায়। উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীপ্রজাতির মোট অক্সিজেনের অধিকাংশটুকু উৎপন্ন হয় এই অঞ্চলে। উপরন্তু এই বনাঞ্চল একরকম সৌর-ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করে যা সূর্যকিরণ শুষে নিয়ে ভূমন্ডলের তাপকে নিয়ন্ত্রিত করে।

সংক্ষেপে বলা যায়, এই নিরক্ষীয় বর্ষা-বনাঞ্চল হ'ল মানবজাতির পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের এক বিপুল ভান্ডারবিশেষ, অথচ সর্বত্রই তার বিনাশসাধন চলছে। ১৯৮২ সালে এই অঞ্চল ব্যাপ্ত করেছিল মোট প্রায় ১২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার পরিসর যা পৃথিবীর নিয়মিত উষ্ণ ও উচ্চবর্ষণশীল অঞ্চল বলে পরিচিত। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-র হিসেব অনুযায়ী, প্রতি বছর ১,৫৭,০০০ বর্গকিলোমিটার হারে এই অরণ্য অঞ্চল সাফ হয়ে চলেছে। এই পরিমাণটি হ'ল ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মোট স্থলভাগের সমান।

এ অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা। এইভাবে চলতে থাকলে ২০৫৭ সালের মধ্যে সমগ্র নিরক্ষীয় বনাঞ্চল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বিশ্বের বর্ষা-বনাঞ্চলের প্রায় একের তিন ভাগ ব্রাজিলে অবস্থিত এবং একের দশ ভাগ অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার। এই বনাঞ্চলের প্রায় চার শতাংশ ভারতে অবস্থিত। এ সম্পর্কে আমাদের একটা সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। কারণ, বিশ্বের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে এই বনাঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। উপরন্তু বিশ্বের অংসখ্য বৈচিত্রময় প্রাণী-প্রজাতির আশ্রয় হিসেবে এবং বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের যোগানদার হিসেবে এই অঞ্চলের গুরুত্ব সবিশেষ। জীবনধারার পক্ষে অপরিহার্য এইসব ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়া উচিত নয়। তাই গড়ে উঠেছে এক ধরনের আন্তর্জাতিক আইন যা কোন ব্যক্তি, সংস্থা অথবা কোন রাষ্ট্রের লঙ্ঘন করার অধিকার নেই। কারণ সামান্য কিছু লোকের এই অধিকারকে সংযত করতে না পারলে সমগ্র মানবজাতি অদূর ভবিষ্যতে তার টিকে থাকার অধিকার হারাবে।

কিন্তু এসব কিছু বিস্মৃত হয়ে কিছু অতিকায় বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থা যেমন Goodyear, Volkswagen ও Nestle ইত্যাদি আজ বেপরোয়াভাবে ব্রাজিলের এই বর্ষা-বনাঞ্চলকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ও ধ্বংস করছে। তারা হয়তো গোমাংস ব্যবসায় বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা একই সাথে বিপুল ধ্বংস সাধনও করছে।

বছর কয়েক আগে ইন্দোনেশিয়ায় এই বর্ষা-বনাঞ্চল সাফ করে ফেলার এক বিশাল কর্মসূচী শুরু হয়েছিল। একদিকে বহু সহস্র জমি-কাঙাল জাভাবাসীকে সুমাত্রা, কালিমন্তন, সুলায়েসি ও পশ্চিম ইরিয়ানের এই জাতীয় বনাঞ্চলে স্থানান্তরিত করা শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর অনুগত ৭৩ জন সেনাপ্রধানকে International Timber Corporation of Indonesia (Wyeyerhauser) টাকা দিয়েছিল তার নিজের শেয়ারগুলো কিনতে এবং ৩৫ শতাংশ মুনাফা লাভ করতে। বিনিময়ে Wyeyerhauser পেয়েছিল ১.৫ মিলিয়ন একর বর্ষা-বনাঞ্চল সাফ করার অনুমতি।

(খ) পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প ঃ

পেট্রোলিয়ম-ভিত্তিক উচ্চমাত্রার টক্সিক কেমিক্যালের অশেষ যোগানদার হিসেবে এই শিল্প পরিবেশদূষণের অন্যতম ভয়ঙ্কর উপাদান। এর একটি কারণ অবশ্য এর উৎপাদিত সামগ্রীর চরিত্র। কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অন্য কারণটি হল এই শিল্প আর্থিক অগ্রগতি সাধন করে। আমরা জানি যে আমাদের ভূমন্ডল পেট্রোকেমিক্যাল

সামগ্রীকে বিনাশ করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একখন্ড সুতির কাপড়কে যদি মাটিতে পুঁতে রাখা হয় তবে কালক্রমে তা মাটিতে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু একখন্ড নাইলন কাপড়কে যদি ঐভাবে মাটির তলায় রাখা হয় তবে তা কখনোই মাটিতে মিলিয়ে যাবে না। অন্যভাবে বলা যায়, একখন্ড সুতির কাপড় ভূ-ব্যবস্থায় (Earth System) সম্পৃক্ত হয়ে মিলিয়ে যায় এবং তাই তা প্রাকৃতিক পরিবেশ-ব্যবস্থায় ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু নাইলনের ক্ষেত্রে তা হয় না। এর অর্থ, একবার উৎপাদিত হ'লে পেট্রোকেমিক্যাল সামগ্রী বিশ্বের বাস্তুতন্ত্রে অসমঞ্জস উপাদান হিসেবে ক্রমবর্ধমানভাবে জমতে থাকে। অতএব যদি মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে এইসব সামগ্রী উৎপাদিত হয় তাহলে ক্রমাগতই মজুত হতে থাকবে। এই সবই হ'ল দূষণ।

এতএব পেট্রোকেমিক্যাল-ভিত্তিক অর্থনৈতিক বিকাশ মানেই মোট জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধিই শুধু নয়, মোট জাতীয় দূষণেরও বৃদ্ধি। এই অর্থনৈতিক বিকাশ মানেই ডেটারজেন্ট, রাসায়নিক সার, পেট্রোকেমিক্যালজাত জামা কাপড় ও নানা আচ্ছাদন সামগ্রী ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান উৎপাদন। ডেটারডেন্টগুলিই হ'ল সবচেয়ে ক্ষতিকর। ১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আত্মপ্রকাশ করে ৩০ বছরের মধ্যে ফসফেট নিষ্ক্রমণ প্রবাহকে সাতগুণ বৃদ্ধি করেছে, যা তৎপূর্ববর্তী ৩০ বছরে (১৯১০—১৯৪০-য়ের মধ্যে) বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র দ্বিগুণ। এগুলো ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ বলেও মনে করা হয়। আরো মারাত্মক হলো রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি। বলা হয় যে, আমেরিকার কৃষির ভিত্তি মাটি নয়, তেল। কিন্তু ১৯৪৫-এর পর চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাষীদের দ্বারা কীটনাশকের ব্যবহার ছ'গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তবু কীটপতঙ্গের দ্বারা শস্যহানি ঘটেছে প্রায় দ্বিগুণ। তাছাড়াও রাসায়নিক সার ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ শেষ পর্যন্ত মাটির তলায় গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলে মিশছে এবং এমনকি খাদ্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছে। পরিশেষে উল্লেখ করতে হয়, তেল কোম্পানীগুলো তৃতীয় বিশ্বে এমন সব বিষাক্ত সামগ্রী বিক্রি করে চলেছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ধনী দেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

(গ) পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন ঃ

সাম্প্রতিককালে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিল ধ্বংসকান্ডের ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন কী বিপজ্জনক এক প্রয়াস। এমনকি যদি এই জাতীয় দুর্ঘটনা নাও ঘটে তবু আণবিক শক্তির উৎপাদন কেন্দ্রগুলি মনবীয় পরিবেশের স্থায়ী ক্ষতিসাধন করেই চলবে। এইসব কেন্দ্রগুলি বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত আবর্জনা নির্গত করছে যা কোনভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না। নির্গত এই বর্জ্যবস্তুর নানা প্রকাশ আছে যার মধ্যে সবচেয়ে কম নজর দেওয়া হয় পারমাণবিক fission থেকে সৃষ্ট অতিমাত্রার উষ্ণতা। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক থেকে এ হ'ল এক সামগ্রিক অপচয়। কারণ এর জন্যে যা করতে হবে তা হ'ল উচ্চচাপসম্পন্ন বাষ্প উৎপন্ন করা যা শক্তি-উৎপাদনকারী চাকা ঘোরাতে সক্ষম। এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রয়োজন ২০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের, তার বেশি নয়। অতএব জল ফোটানোর জন্য যদি পারমাণবিক চুল্লী ব্যবহার করতে হয় তবে তা হবে মশা মারতে কামান দাগার মত ব্যাপার। মশাটা ঠিকই মরবে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এর ফলে ঘটে যাবে। অনুরূপভাবে, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলির দরুন যে তাপ সঞ্চারিত হয় তা শুধুই অপচয় নয়, ববং তার দ্বারা সৃষ্টি হয় ভয়ঙ্কর তাপ-দুষণ। শুরুতে, তাপের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অঞ্চল সৃষ্টি হয়। কিন্তু ক্রমশ পারমাণবিক উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা যত বাড়তে থাকে ততই সমগ্র জীবমন্ডল তাপদূষণে পরিকীর্ণ হতে থাকবে। এটা অবশ্য এক সুদূর সম্ভাবনা। আমাদের শুধু এইটুকু মনে রাখতে হবে যে একটি মাত্র পারমাণবিক তাপ-উৎপাদন কেন্দ্র সমগ্র হাডসন নদীর জলকে ৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উত্তপ্ত করতে পারে।

এই মাত্রাতিরিক্ত তাপ সঞ্চার করা ছাড়াও সাধারণ এইসব পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রগুলি নির্গত করে চলে চূড়ান্তভাবে তেজস্ক্রিয় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী অদৃশ্য সব গ্যাস। পাশাপাশি প্রতিটি রিঅ্যাক্টর থেকে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয়

বর্জ্য পদার্থ হাজার হাজার বছর ধরে toxic (বিষাক্ত?) থেকে যায়। এই বর্জ্য পদার্থের সবচেয়ে বিপজ্জনক উপাদান হ'ল প্লুটোনিয়াম — যার নামকরণ করা হয়েছে গ্রীক পুরাণে অন্ধকারের দেবতা প্লুটোর নামানুসারে। এই প্লুটোনিয়ামের বিষাক্ত শক্তি অটুট থাকে অন্তত অর্ধ মিলিয়ন বছর যাবৎ — যা আমাদের দীর্ঘ লিপিবদ্ধ ইতিহাস কালে প্রায় ১০০ গুণ বেশি দীর্ঘ। এই প্লুটোনিয়াম এতই বিষাক্ত যে যদি সমভাবে একে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে মাত্র এক পাউন্ড প্লুটোনিয়াম সমগ্র মানবপ্রজাতির ফুসফুস — ক্যান্সারের আশঙ্কা প্রকট করে তুলতে পারে। অথচ প্রতিটি পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রই নিয়মিত প্রতি বছর চার থেকে পাঁচশ পাউন্ড প্লুটোনিয়াম উদ্‌গীরণ করে চলেছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে প্লুটোনিয়ামের অনিবার্য — উৎসারণের (unavoidable leakages) দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শিল্প ২০২০ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যুহার ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করবে।

সব শেষে উল্লেখ্য, পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়ার পরও দূষণগত সমস্যা থেমে যায় না। এই শক্তিকেন্দ্রগুলি পুরোপুরি বন্ধ করে দেবার পর ১৫০ থেকে ২০০ বছর সময়ের মধ্যে এর সংক্রমণকারী ক্ষমতা রোধ করা বা এগুলোকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া যায় না। এই কারণে তাদের তেজস্ক্রিয় কাঠামো এবং অন্যান্য উপাদানগুলি বিপুল পরিমাণ প্রতিরোধক সামগ্রীর তলায় চাপা দিতে হয়। সাধারণত একটি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের জীবনকাল ৩০ বছরের বেশি নয়, ফলে জীবন্ত কেন্দ্রগুলির চেয়ে নির্বাপিত কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বাড়তে থাকে। এথেকে বোঝা যায়, যতই দিন যেতে থাকে ততই পরবর্তী পারমাণবিক কেন্দ্রটি কোথায় গড়ে তোলা যাবে তা ঠিক করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। বর্তমানে প্রায় ৩৭৫টি অসামরিক পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর সারা বিশ্বে চালু আছে, এবং তার চাইতে অনেক বেশি সংখ্যায় আছে বোমা তৈরির জন্যে গড়ে তোলা প্লুটোনিয়াম সৃষ্টিকারী পারমাণবিক কেন্দ্র। কালক্রমে এইরকম আরো অনেক পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র তাদের জীবনকাল শেষ করে স্তব্ধ হয়ে যাবে গড়ে উঠবে নতুন আরো কেন্দ্র। ফলস্বরূপ, মারাত্মক জীবননাশী এইসব কাঠামোর বৃদ্ধি ঘটবে। এর ফলে বিশ্ব পরিবেশ ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে তা কল্পনা করা কঠিন নয়।

(ঘ) সমকালীন সমরবাদ বাহুল্য ঃ

একালের সমরবাদ বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রবল প্রভাব ফেলেছে। মানুষের বসবাসব্যবস্থার বিপুল ক্ষতিসাধন করছে এই সামরিক প্রস্তুতির প্রক্রিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের MX-র ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার নির্মাণ এর এক দৃষ্টান্ত। ইতিহাসের বৃহত্তম নির্মাণ পরিকল্পনা এটি — যা মিশরের পিরামিড, আলাস্কার পাইপলাইন এবং পানামাখাল নির্মাণের থেকেও বড় প্রকল্প। তাছাড়া এই ক্ষেপনাস্ত্র-নির্মাণ প্রকল্পের বাবদ খরচের হিসেব সময়ের সাথে সাথে বেড়েই চলেছে। যদিও কেউই জানতে পারে না শেষ পর্যন্ত এই খরচের অঙ্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তবু ১৯৮০ সালের নভেম্বরে অথবা প্রকল্প সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার এক বছরের মধ্যে যে হিসেব হয়েছিল সেই অনুযায়ী ৩০ বছরের জীবনকালে ১০৮,০০০ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে। স্বভাবতই এই বিপুল ব্যয়ের প্রকল্প পরিবেশের ধারণকারী উপাদানসমূহকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। হাজার হাজার টন ধুলো ও আবর্জনা ঠেলে সরানো হবে বুলডোজার Earth movers ও অন্যান্য ভারী যন্ত্র ও যানের সাহায্যে। এটা বিশেষভাবে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে নেভাদায় যেখানে আগ্নেয়গিরি-উত্থিত ভস্মস্তরে 'Erionite নামক ক্যান্সারসৃষ্টিকারী রাসায়নিক উপাদান বর্তমান। এই ধুলার ধূম্রজাল থিতিয়ে যেতে অনেক মাস সময় নেবে, ইতিমধ্যে কিছু ধুলো, ইরওনাইট ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যত্রও বাতাসের সাথে ছড়িয়ে গিয়ে থাকবে।

উপরন্তু 'নির্মাণ' কর্মকান্ডের মাত্র একটি অংশ হলো রাস্তাঘাট তৈরির কাজ। তদুপরি প্রতি ২৩টি ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য একটি হিসেবে মোট ৪,৬০০টি বিশাল মজবুত কংক্রিটের আস্তানা, এবং ৫০,০০০ লোকের বাসস্থানের

ব্যবস্থা করতে হয়। সমগ্র প্রকল্পটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ১০০ থেকে ২০০টি সিমেন্ট উৎপাদন কারখানা, যা ১০০ মিলিয়ন টন উপরিস্তর মৃত্তিকাকে খুঁড়ে সরায়।

এই পরিস্থিতিতে ধুলো চাপা দেওয়ার কোন কর্মসূচী সফল হওয়ার আশা নেই। প্রকৃতপক্ষে আবহাওয়া মন্ডলের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় উপত্যকাগুলিতে এই ধুলোর ধূম্রজালকে দীর্ঘকালিন মেয়াদে আটক করা গেছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই যে MX-র ২০ বছর-ব্যাপী অপারেশন ও নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় জলের যে হিসেব করা হয়েছিল তার খরচ প্রকল্পের খরচের চেয়ে বেশি। ১৯৮০ সালে অঙ্কটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১,১২,০০০ মিলিয়ন গ্যালন এবং এখন এটা হয়েছে ১,৯০,০০০ মিলিয়ন গ্যালন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই মাটির তলার জলস্তরে ইতিমধ্যেই যে অবনমন ঘটেছে তা আরো বেশি করে অবনমিত হবে।

কিন্তু Coyote Spring Valley-তে ভূগর্ভস্থ জলের সরবরাহের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হবে যথেষ্ট বিপর্যয়কারী। শুধু MX-এর জন্যই ঐ অঞ্চলে বাইরের থেকে জল পাইপযোগে সরবরাহ করতে হবে। কিন্তু জল সরবরাহের সঙ্কটই এই প্রকল্পের একমাত্র সঙ্কট নয়। আর একটি বিপদ হলো Hologeton নামে এক বিষাক্ত আগাছা যা ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকার বিপর্যয়ের ফলে বিপুলভাবে গজিয়ে ওঠে এবং যা খেয়ে গরু ভেড়া প্রভৃতি প্রাণী মারা যায়। এক কথায়, নেভাদা ও উটা রাজ্যের বহু বর্গ মাইল অঞ্চল জুড়ে পশুচারণ প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়।

অতএব এই সব রাজ্যের জনগণ যুদ্ধকালীন সময়ে প্রত্যক্ষ পারমাণবিক আক্রমণের সম্ভাব্য শিকারে পরিণত হয়, এমনকি যখন যুদ্ধ ঘটছে না তখনও MX-য়ের দরুন লোকবসতি আগাগোড়া ধ্বংসের মুখে পড়ে।

ধারাবাহিক জীবনযাত্রা প্রণালী ঃ

সহজেই বোঝা যায় যে এই ধরণের যে কোন প্রয়াস প্রকল্প বিশ্বপরিবেশকে এত দূর বিপন্ন করে তুলতে পারে যে তা আর আমাদের ধারণ করতে বা সহায়তা করতে পারবে না। আর সামগ্রিকভাবে এই জাতীয় প্রকল্পগুলির সমষ্টি আমাদের পরিবেশকে ব্যাপকভাবে বিনষ্ট করবে। সমস্যাটা হলো এই যে এইসব বিপজ্জনক প্রয়াস এতটাই বেগবান হয়ে উঠেছে যে আমরা এগুলোকে হঠাৎ একদিনে থামিয়ে দিতে পারি না। Norman Mayer লিখেছেন ঃ "আমাদের অবস্থাটা একটা Supertanker-এর ক্যাপ্টেনের মত। সে যদি তার Tankerটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চায় তাকে বহু মাইল আগে থেকে তার জাহাজের গতিবেগকে শ্লথ করতে হবে, একেবারে ভিন্নমুখী যাত্রার তো কথাই নেই। সময়টা আমাদের পক্ষে নয়।"

অতএব আমাদের চেষ্টা করা উচিত পরিবেশ-বিধ্বংসী আলাদা আলাদা কর্মকান্ডকে অতিক্রম করে ভাবা। মানবীয় বসত-ব্যবস্থার ক্রমাগত বিনাশকে ব্যাখ্যা করতে পারে এইরকম কিছুর কথাই আমাদের ভাবা উচিত। এই 'কিছু'টা যে কী তা যতক্ষণ আমরা খুঁজে না পাচ্ছি এবং যতক্ষণ এই ধ্বংস প্রক্রিয়াকে আমরা নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারছি ততক্ষণ আমরা আমাদের বসতব্যবস্থা এবং আমাদের নিজেদের বাঁচাতে ব্যর্থ হব। ধারাবাহিক জীবনপ্রণালী বলতে যা বোঝায় তা শূন্যে গড়ে তোলা যায় না। তার জন্যে চাই এমন সামাজিক ব্যবস্থা যা প্রকৃতির সংরক্ষণকে এক চূড়ান্ত আদর্শ হিসেবে স্বীকার করবে। কারণ, যদি আমরা চাই যে আমাদের প্রজাতিকে পৃথিবী ধারণ করে থাকুক তবে জীবন-সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে পৃথিবীকে লালন করতে আমরা বাধ্য। এ হলো এক পারস্পরিক সম্পর্ক।

আমরা আগের অধ্যায়ে কিছু কিছু বিশ্লেষণ করেছি কীভাবে এই বাস্তুতন্ত্র নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের বিনাশ ও অন্যান্য বিপজ্জনক প্রয়াসের দ্বারা বিপর্যস্ত হচ্ছে। লোকে এগুলোকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে বোঝে না। পৃথিবীর

জীবন-সহায়ক ব্যবস্থা কীভাবে এসবের দ্বারা বিপন্ন হয় লোকে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কারণ তারা দেখে যে এতে তাদের স্বার্থ সিদ্ধ হচ্ছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে মানবীয় বসত-ব্যবস্থার বিনাশের মূলে আছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। অতএব, ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবন যদি আটকানো না যায় অথবা বিপরীতমুখী না করা যায় তবে পরিবেশ সংরক্ষণের কজে আমরা কিছু করে উঠতে পারবো না। আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো প্রচলিত পরিস্থিতি বিষয়ে গণসচেতনতা গড়ে তোলা। পরিবেশ সুরক্ষা যখন এক যথার্থ ও জীবন্ত রাজনৈতিক বিষয় হয়ে দাঁড়াবে তখনই ধারাবাহিকতাপূর্ণ জীবনপ্রণলী গ্রহণ করা যাবে। এটাই স্বাভাবিক যে এই ধরনের ধারাবাহিকতাপূর্ণ এক সভ্যতা নিজস্ব এক নতুন নৈতিক মূল্যবোধ, এক নতুন সাংগঠনিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

বস্তুতপক্ষে, আজকের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মূলে রয়েছে একালের সামরিক — শিল্পোন্নত সভ্যতা যথেষ্ট মনে করে না। এই সভ্যতা ক্রমবর্ধমান চাহিদার দ্বারা পরিচালিত হয়। ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা থেকে জন্ম নেয় অস্ত্র, আরো অস্ত্র — এই দাবি। অনুরূপভাবে আরো-আরো ভোগের ইচ্ছা, তবু যথার্থ কোন তৃপ্তির সম্ভাবনা নেই। তবু ধনীদের ভোগবাসনা যদি যথেষ্টতার ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায় তবেই সমস্ত মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের পূরণ সম্ভব হবে। তখনই আমরা পরিবেশের সংরক্ষণ ঘটিয়ে তার সাথে বাঁচতে শিখব। এবং তখনই আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং নিজেদের মানবজাতির বিরুদ্ধে হিংসা বর্জন করতে পারব।

অনুশীলনী ৫

দ্রষ্টব্য ঃ ১) নীচের খালি জায়গা ব্যবহার করুন। ২) পূর্ববর্তী আলোচ্য বিষয়ের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

১) সংক্ষেপে মানুষের সেইসব কর্মকান্ডের আলোচনা করুন যা বিশ্বের বাস্তুব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলছে।

---

২) বাস্তুব্যবস্থার সঙ্কট ঠেকাতে কিছু উপায় নির্দেশ করুন।

৩৩.৮ সারাংশ

এই এককে আমরা বাস্তুতন্ত্রের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছি এবং তার বিপর্যয়ও আলোচনা করেছি। বর্তমান বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কটকে ঠেকানোর ব্যাপারে আমাদের কী করণীয় তার দিকেও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

৩৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

'Boader, PJS and Seed, R 1985	An Introduction to Coastal Ecology, Chapman & Hall, New York
Sapru, RK, 1957	Environmental Management in India (Vol I & II) Ashis Publishing House, New Delhi, 1957
Singh, Samar, 1986	Conserving India's Natiional Heritage, Natraj Pub., Deharadun
Varshney, C. K. (Ed), 1983	Water Pollution and Management, Wiley Eastern Ltd., New Delhi.
Banerjee, BN	Environmental Pollution and Bhopal Killings, Gian, New Delhi
Gare, A and Elliot R, 1983	Environmental Philosophy, The Open University Press Milton Keynes, UK.
Harvell A Mark, 1984	Nuclear Winter, Springer Verlag, New York.

৩৩.১০ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী ১

১) বাস্তুতন্ত্র হ'ল এমন এক আধার যার মধ্যে আছে প্রাণীজগৎ ও তার পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারা। একটি প্রাণীর সাথে তার পরিপার্শ্বের সম্পর্কের মধ্যে এক স্বাভাবিক ভারসাম্য বর্তমান। সাধারণত এই ভারসাম্য নিজে থেকেই গড়ে ওঠে। মানুষের হাতে এই স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় ইদানিংকালে প্রতিবেশব্যবস্থার অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়েছে।

অনুশীলনী ২

১) বাস্তুতন্ত্রের সঙ্কট বলতে প্রধানত বোঝায় প্রাণীসমূহ ও তদের পরিবেশের মধ্যকার স্বাভাবিক ভারসাম্যের বিপর্যয়। এই বিপর্যয় ঘটছে মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের দরুন। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের পারস্পরিক স্বাভাবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের একজন হস্তক্ষেপকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর ভূমিকা। এর ফলে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে তাই আজ সাধারণভাবে বাস্তুতন্ত্রগত সঙ্কট নামে পরিচিত।

২) আজ আমাদের বাস্তুতন্ত্র নানা দিক থেকে বিপদের সম্মুখীন। প্রথমত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ও কীটনাশক থেকে গড়ে ওঠা বিপদ। দ্বিতয়ত 'সবুজ ঘরের প্রতিক্রিয়া' (Green House Effect) থেকে গড়ে ওঠা বিপদ। এই 'সবুজ ঘর প্রতিক্রিয়া'র ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বর্ধমান সঞ্চয় ঘটছে? আমাদের বাস্তুতন্ত্র আজ এইরকম কয়েকটি বিশিষ্ট বিপদের মুখোমুখি।

অনুশীলনী ৩

১) (ক)

২) (ক)

৩) (ক)

অনুশীলনী ৪

পরিবেশগত অবক্ষয় বলতে মূলত বোঝায় সময়ের স্বাভাবিক ধারায় ক্ষয়ীভবন। পরিবেশ দূষণ থেকে এই প্রক্রিয়ার ধারা ভিন্ন। পরিবেশের অবক্ষয় হ'ল এক স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া, অন্য দিকে দূষণ হ'ল মূলত এক মনুষ্যসৃষ্ট প্রক্রিয়া।

অনুশীলনী ৫

মোটামুটিভাবে মানুষের চারটি কাজের ফলে বাস্তুতন্ত্রের ব্যবস্থার যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হচ্ছে। এই কাজগুলি হল ঃ (১) নিরক্ষীয় বর্ষা-বনাঞ্চলের বিনাশ সাধন; (২) পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পের প্রতিষ্ঠা যা থেকে উৎপন্ন হয় বিষাক্ত গ্যাস, রাসায়নিক পদার্থ এবং অন্যান্য টক্সিক পদার্থ; (৩) পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন; এবং (৪) মাত্রাতিরক্ত সমরবাদ। এইসব বিপদের দীর্ঘ-মেয়াদি সমাধান হ'ল জীবন-সমর্থনকারী ব্যবস্থার স্বনির্ভরতা।

একক ৩৪ □ বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিকাশ

গঠন

৩৪.১ উদ্দেশ্য

৩৪.২ প্রস্তাবনা

৩৪.৩ বিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞা

৩৪.৪ বিজ্ঞানের নানা দিক ও প্রয়োগ

৩৪.৪.১ বিজ্ঞানের গতিশীল চরিত্র

৩৪.৪.২ গবেষণা ঃ বিজ্ঞানের একটি দিক

৩৪.৪.৩ সামাজিক রূপান্তরের মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞান

৩৪.৫ বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

৩৪.৫.১ বস্তুনিষ্ঠতা

৩৪.৫.২ পরীক্ষানিরীক্ষা

৩৪.৬ বর্ণবৈষম্য এক অবৈজ্ঞানিক মতাদর্শ ও নয়া উপনিবেশবাদের সহায়ক

৩৩৪.৬.১ বৈজ্ঞানিক মানসিকতার আবশ্যক শর্তাবলী

৩৪.৭ সারাংশ

৩৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩৪.৯ উত্তরমালা

৩৪.১ উদ্দেশ্য

বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিকাশ বিষয়ে এই এককটি পর্যায় আটের শেষ আলোচ্য বিষয়। এই পর্যায়ের পূর্ববর্তী এককগুলোতে অর্থাৎ ৩১, ৩২, এবং ৩৩ এককে আপনারা আন্তর্জাতিক পরিবেশের সঙ্গে জড়িত সমস্যাগুলি নিয়ে অধ্যায়ন করেছেন—যে সমস্ত সমস্যাগুলি দ্বারা আমাদের দেশ লক্ষণীয়ভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং যেগুলি সম্পর্কে আমাদের সক্রিয় হওয়া উচিত। বর্তমান এককে পড়া হবে বৈজ্ঞানিক মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী কীভাবে গড়ে ওঠে যার সাহায্যে আমরা বিশ্বের প্রধান সমস্যাগুলোকে বুঝতে পারি এবং কীভাবে তা আমাদের দেশকে প্রভাবিত করে সেটা বিষয়গত ও বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করতে পারি।

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হ'ল ঃ

- বিজ্ঞানের মূল ধারণাসমূহ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সাথে পরিচয় ঘটানো।
- বৈজ্ঞানিক মনোবাবের সম্ভাব্য লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করা।
- সমাজের প্রতি বৈজ্ঞানিক মনোভাব, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ এবং বিজ্ঞানের সুফলগুলিকে সংক্ষেপে তুলে ধরা।

৩৪.২ প্রস্তাবনা

আমাদের সংবিধানের 51(A) অনুচ্ছেদ যেখানে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে অন্যতম কর্তব্য হিসেবে নাগরিকদের বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবীন নাগরিগকেদর তাই প্রথমেই প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক মনোভাব বলতে ঠিক কী বোঝায় তা জানা এবং তার অনুশীলন করা। সংবিধানে উল্লিখিত বলেই যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তোলা এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাই নয়, অন্য কারণেও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অনুধাবন ও অনুশীলন বিশেষ জরুরি। বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তুলতে পারলে কোন সমস্যা বোঝা ও সমাধান করা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হয়, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সৃজনশীল কাজে বুদ্ধিবাদী মানসিকতা সৃষ্টি হয়। অবশ্য বৈজ্ঞানিক মানসিকতা জীবনে সাফল্য অর্জনে কোন যাদুমন্ত্র নয়, অথবা এটা হঠাৎ-ই আয়ত্ব করার জিনিষও নয়। এটা আয়ত্ব করতে হলে বেশ কিছু সময় ধরে সযত্ন অভিনিবেশ ও পর্যালোচনার আশ্রয় নিতে হয়।

এই পাঠক্রম অনুসরণ করছেন যেসব ছাত্রছাত্রী তাঁদের অনেকেই যেহেতু বিজ্ঞানের সাথে সবিশেষ পরিচিত নন, তাই আমরা প্রথমেই খুব সংক্ষেপে বিজ্ঞান কী তা নিয়ে আলোচনা করব। যদিও বিজ্ঞানের কোন স্পষ্ট নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ সম্ভব নয়, তবু এর সম্পর্কে কিছু ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব। এই ধারণা থেকেই পরবর্তী পর্যায়ে আমরা ব্যাখ্যা করব 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' ও 'বৈজ্ঞানিক মনোভাব' সম্পর্কিত ধারণাগুলি। আপনারা হয়তো বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন যে 'বিজ্ঞান' বা 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' কোনটিকেই স্পষ্ট ও সরলভাবে বর্ণনা করা যাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে, এই ধারণাগুলি সম্পর্কে মতপার্থক্য, এমনকি মতের সংঘাতও থাকতে পারে। এমনকি কেউ কেউ এমন কথাও বলতে পারেন যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বলে কিছু নেই। অবশ্য আমাদের বিশ্বাস বর্তমান এই আলোচনা থেকে আপনাদের নিজেদেরই কিছু ধারণা গড়ে উঠবে, এবং যদি আগ্রহী হন তবে এই বিষয়ে অন্য কিছু বইও পড়তে পারেন। এগুলি পড়ে যদি আপনাদের মনে হয় যে এগুলি অর্থবহ তবে আপনারা নিজ নিজ প্রত্যয় অনুশীলন করতে পারেন।

৩৪.৩ বিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞা

আমরা কী বিজ্ঞানকে সংজ্ঞাবদ্ধ করতে পারি? একজন অতিসাধারণ মানুষ এমনকি নিরক্ষর লোকেরও বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু ভাসাভাসা ধারণা আছে। সম্ভবত তার মাথায় বিজ্ঞান বলতে যে ধারণা সৃষ্টি হয় তা রেডিও, টিভি, এরোপ্লেন, মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত উপগ্রহ ইত্যাদির মত মানুষের বিস্ময়কর উদ্ভাবনগুলির সাথে যুক্ত। কেউ

কেউ আবার বিজ্ঞান বলতে বোঝেন জীবনদায়ী ওষুধ, কেউ আবার বিজ্ঞান বলতে আমাদের নানা দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীকে বোঝেন যেমন জলের মগ থেকে বলপয়েন্ট পেন পর্যন্ত সব কিছুই। বস্তুত আমাদের জীবন আধুনিক নানা আবিষ্কারের সাথে কত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত তা Neil Postman ও Charles Weingartner-য়ের লেখা Teaching as a Subversive Activity বইয়ের অন্তর্গত একটি ছোট্ট অনুচ্ছেদের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ ঃ

"....এই শতাব্দে অনেকগুলো ব্যাপার ঘটেছে এবং তাদের বেশির ভাগই বাড়ির দেওয়ালের সাথে প্লাগ দিয়ে যুক্ত। ...কল্পনা করুন আপনার বাড়ি এবং আশেপাশের অন্যান্য বাড়ি ও অট্টালিকাগুলিকে চারদিকে থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে; এবং এইসব বাড়ি থেকে গত ৫০ বছরে উদ্ভাবিত সমস্ত ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী সরিয়ে নেওয়া হয়েছে...সেখানে চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ নেই, নেই কোন মিউজিক ডিস্ক, টেপরেকর্ডার, টেলিফোন অথবা টেলিগ্রাফ। যদি ভাবেন যে এইসব ইলেকট্রনিক মাধ্যম না থাকায় বড়জোর বিনোদন ও সংবাদ প্রাপ্তিতে বাধা হবে তো মনে রাখা দরকার এর পর কোন সময় বৈদ্যুতিক আলো, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার অথবা রুম হিটার ও সরিয়ে নেয়া হবে। ফলে একদিনের বেশি জীবনধারণ করতে হলে আপনি যা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ হয়ে দাঁড়াবেন।"

কিন্তু এ ধরণের অনুভব, বা বিজ্ঞানের উপর আমাদের নির্ভরতা কোনটিই বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণ করে না। বিজ্ঞান এবং আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি আমাদের জীবনে এমনভাবে মিশে গেছে যে আমরা কখনো কখনো এগুলিকে অতি স্বাভাবিক বলে ভাবি, এবং আমাদের ব্যবহার্য্য সামগ্রীগুলো কীভাবে প্রস্তুত হয় তা নিয়ে ভাবি না। আমাদের মধ্যে ক'জনেরই বা চিন্তার মধ্যে আসে পেন্সিলের মধ্যে কালো সীসে কীভাবে পোরা হয় অথবা কীভাবে বলপেনের মধ্যেকার ক্ষুদে ক্ষুদে বলগুলো এত নিপুণভাবে তৈরি হয়। আমরা লক্ষ্য করি যে প্রতিটি সামগ্রী ও প্রতিটি প্রক্রিয়ার সাথেই বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট।

আবার বিজ্ঞানের সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে যদি আমরা ইতিহাস বিশ্লেষণ করি তাহলেও আমরা সফল হবো না। শত সহস্র বছর আগে মানবপ্রজাতির যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন থেকে তাঁরা প্রাকৃতিক পরিবেশের দিকে তাকাতে এবং খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রয়োজনে কিছু করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। একেবারে গোড়ার দিকেই বিজ্ঞান বোধহয় ছিল ফলমূলপাতা ইত্যাদির মধ্যে কোনগুলি খাদ্য এবং কোনগুলি অখাদ্য-তা নিরূপণ করা। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে এবং কৌতুহলের বশে তার চারপাশের যা কিছু বর্তমান তাকে অন্বেষণ করে, পরীক্ষানিরীক্ষা করে, আবিষ্কার করে ও ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। এইভাবে বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড মানব-অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বহুকাল আগে থেকেই বিশেষ বিশেষ বৃত্তি বা কর্মধারায় বিশেষ দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল যার ফলে কেউ কেউ বিশেষ ধরনের হস্তশিল্পে, কেউ চিকিৎসায় আবার কেউবা জ্যোতির্বিদ্যায় বিশারদ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ আবার আমরা দেখছি আমাদের জীবনের সকল দিকে বিজ্ঞানের যে সর্বব্যাপী বিস্তার তার ফলে আমরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের কোন না কোন কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছি। স্বভাবতই এইরকম সর্বব্যাপী মানবীয় কর্মকান্ড সুসংবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা শক্ত।

প্রকৃতপক্ষে, এক সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের ইতিহাসকার অধ্যাপক জে.ডি বার্নল তার 'ইতিহাস বিজ্ঞান' (Science in History) নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ আমর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এ ব্যাপারে আমায় নিশ্চিত করেছে যে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণের কোন চেষ্টা, যে চেষ্টা বহুভাবেই করা হয়েছে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের কোন একটি ক্ষুদ্র দিকের অল্পবিস্তার এক অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা দিতে পারে মাত্র। সমাজ বিবর্তনের স্বতন্ত্র এবং বারম্বার সংঘটিত হয়না এমন যে প্রক্রিয়ার মানবিক কার্যকলাপ জড়িত, বলতে গেলে সেখানে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়াই চলেনা।

৩৪.৪ বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও তার নানা দিক

'বিজ্ঞান' কথাটির মধ্য দিয়ে আমরা যা বোঝাতে চাই তার সম্পর্কে অধিকতার সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে হলে বিজ্ঞানের নানাদিকে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে।

সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে স্পষ্ট দিকটি হল এই যে বিজ্ঞান বলতে মানবজাতির সুদীর্ঘকালব্যাপী অস্তিত্বের মাধ্যমে গড়ে তোলা বিপুল জ্ঞানভান্ডারকে বোঝায় কিন্তু বোধহয় বিগত ১০ হাজার বছরের মানবসভ্যতার সঞ্চিত জ্ঞানভান্ডারই এক্ষেত্রে অধিক প্রাসঙ্গিক। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে সবচেয়ে নাটকীয় অগ্রগতি হয়েছে বিগত কয়েক'শ বছরে। এই অগ্রগামী জ্ঞান বিস্তৃত হয়ে আছে সব কিছুতে—অণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর কণা থেকে আকাশের গ্রহ, ও ছায়গ্রহ ইত্যাদির মত সুবিশাল বস্তুপিন্ড পর্যন্ত। এই জ্ঞান বিস্তৃত আছে সমস্ত গাছপালা ও প্রাণীজগত, স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে, খাদ্য ও ঔষধ বিষয়ক সকল তথ্যে। মানুষের শরীর ও মন সম্পর্কিত সকল অন্বেষণের সঙ্গে বিজ্ঞান জড়িত। পুডিং খেতে কেমন তা যেমন না খেয়ে বোঝা যায় না তেমন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তার বিস্ময়কর সাধারণ সূত্রগুলির নির্ভরযোগ্যতা সেগুলোর প্রয়োগ ছাড়া পরীক্ষিত হতে পারে না। এই প্রয়োগের মাধ্যেমেই উড়োজাহাজ ওড়ানো হয়, খাদ্যশস্য ফলানো হয়, দৈনন্দিন জীবনের হাজারো টুকিটাকি সামগ্রী তৈরি হয়, নানা উপায়ে নানা শক্তি উৎপাদন করা হয় যার দ্বারা যন্ত্রপাতি চালানো যায়। এই জ্ঞানসম্পদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই সম্পদ সর্বদাই অসম্পূর্ণ। যতই আমরা এই জ্ঞান আয়ত্ত করি ততই এই জ্ঞানের জানা ও অজানার সীমারেখায় দাড়িয়ে নানা প্রশ্নের জন্ম হয়। এইভাবে ক্রমশই নতুন নতুন তথ্যের উদ্ভাবন হয়, এবং নতুন ও পুরোনো তথ্যের ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তত্ত্ব জন্ম নেয়। ফলে পুরোনো জ্ঞানের পরিধির তুলনায় দ্রুততর হারে নতুন নতুন তত্ত্বের বৃদ্ধি ঘটছে। বলা হয় যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশ উদ্ভাবনাকেন্দ্রিক। ভিন্নমত অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় প্রতি ১০ বছরে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্বিগুণ হচ্ছে।

৩৪.৪.১ বিজ্ঞানের গতিশীল প্রকৃতি

এটা স্পষ্ট যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান স্থির দাঁড়িয়ে থাকে না, এটা গতিশীল প্রক্রিয়া। এবং সবচেয়ে ভাল বিজ্ঞানকর্মী তাঁরাই যাঁরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে বদলাতে, শোধরাতে এবং পুরোপুরি নতুন করে ব্যাখ্যা করতে বেশি সক্রিয়। এই কাজকেই সৃজনধর্মী কাজ বলে অভিহিত করা হয় এবং যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্য ধরনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। এসব জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থির বা অপরিবর্তনীয় থাকা একটি গুণ বলে বিবেচিত হয় না কিন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্বজ্ঞানকে বাতিল বা শোধরানোর চেষ্টা বিপদ ডেকে আনে।

৩৪.৪.২ গবেষণা ঃ বিজ্ঞানের একটি দিক

বিজ্ঞানের এই দ্বিতীয় দিকটি প্রথম দিকটির সাথে জড়িত। কারণ নতুন জ্ঞানের অবিরাম অন্বেষণ, যা বর্তমান জ্ঞানসমূহের বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া সম্ভব হতে পারে না, তাকে অব্যাহত রাখতে গেলে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত নানা প্রতিষ্ঠানের এক সমাহার সমন্বয়। একজন ব্যক্তির পক্ষে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ধারার সাথে যুক্ত হওয়ার অর্থ অনেকগুলো বছরের শিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চার প্রতি গভীর অভিনিবেশ ও দায়বদ্ধতা। যারা ওপর-ওপর কিছু তথ্য জানে এবং পরীক্ষা পাশ করতে হয়তো সেগুলো মুখস্ত করে ফেলে তারা যথার্থভাবে কখনো বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে পারে না; তারা বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে বা সামাজিক উন্নয়নের কাজে তাকে প্রয়োগ করতে পারেন না।

শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজন সংযোগমাধ্যম। তাই গবেষণাসংক্রান্ত তথ্যাদি সম্বলিত পুস্তক ও পত্রপত্রিকার প্রকাশনা একটি বৃহৎ শিল্প (Industry)। প্রতি বছর নানাভাষায় লক্ষ লক্ষ বই ও জার্নাল নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এবং বর্তমানে জনশিক্ষার প্রয়োজনে ভিডিও ও অডিও (দৃশ্য ও শ্রাব্য) ক্যাসেট তৈরি হচ্ছে ও সম্প্রচারিত হচ্ছে প্রায় সব দেশেই। এই কাজ, শিল্প ও পেশার সাথে লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানী জড়িত। উপরন্তু ক্লাশরুমের জন্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির যেমন প্রয়োজন তেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলির জন্যেও তা প্রয়োজন। কিছু কিছু উচ্চ-প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ এবং এজন্যে সমবায়ভিত্তিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা উত্তরোত্তর একটি রেওয়াজ হয়ে উঠেছে যেখানে নানা দেশ নানা গবেষণা সংস্থায় যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে। উদাহরণ হিসেবে, ইউরোপীয় দেশগুলির পারমাণবিক গবেষণার এইরকম এক যৌথ কেন্দ্র আছে (CERN)। ভারতেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গড়ে তুলেছে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পারমাণবিক বিজ্ঞানের এক গবেষণাকেন্দ্র যা দিল্লীতে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলগুলির মধ্যে সংযোগসাধনের এই বিপুল আয়োজন এবং বিশেষ ধরনের ও ব্যয়বহুল পরীক্ষানিরীক্ষাগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডকে এক আন্তর্জাতিক চরিত্র দান করেছে। এবং এর জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও জ্ঞানের বিনময় স্বাধীনতা।

৩৪.৪.৩ সমাজের পরিবর্তনসাধনের মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের তৃতীয় দিকটি হ'ল সমাজ কীভাবে তাকে কাজে লাগায়। আজ মানুষ যা কিছু সামগ্রী ব্যবহার করে তার প্রত্যেকটির উৎপাদনের পেছনে আছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। বস্তুত প্রতিটি উৎপাদনশীল কর্মের ভিত্তিমূলে আছে বিজ্ঞান। কৃষির দিকে তাকালেই দেখা যাবে এক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রকৃতির সবচেয়ে কাছাকাছি এবং মনে হতে পারে যে ধান, গম এবং শাকসব্জি হয়তো 'প্রাকৃতিকভাবেই' উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমাদের মানবসভ্যতার বর্তমানস্তরে এটা ঘটে না। কৃষি উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন সঠিক বীজ যা বিশেষজ্ঞদের সযত্ন প্রয়াসে সৃষ্টি হয়। জমিখন্ড যদি বৃহদাকার হয় তবেতা কর্ষণ করতে প্রয়োজন যন্ত্রের। কৃষিতে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক বড় বড় কারখানায় উৎপাদিত হয়। জলসেচ অব্যাহত রাখতে যে গভীর নলকূপ ব্যবহার হয় তা বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। এমনকি শস্যের যথাযথ মজুতের জন্যও বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রয়োজন যাতে শস্য নষ্ট না হয়। উৎপন্ন সামগ্রীর উন্নতির জন্য এবং বাণিজ্যিক পণ্যের উৎপাদন মূল্য কমিয়ে আনতে নিয়মিত ও সচেতনভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। দরকারমত প্রযুক্তির দ্বারা উৎপন্ন কাপড় আধুনিক মিলে তৈরি আধুনিক বস্ত্রের চাইতে সস্তাও নয়, সূক্ষ্মও নয় অতএব যদি কোন দেশ তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য বিক্রি করতে চায় তাহলে তাকে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে তার পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করতে সর্বোৎকৃষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কজে লাগানো যায়। এই উদ্দেশ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন। এবং এই উন্নতি শুধু যে বাণিজ্যের সুবিধা বৃদ্ধি করে তাই নয়, এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরও সমৃদ্ধি সাধিত হয়। অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, উৎপাদন-উপকরণগুলির দ্বারাই সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় এবং এই সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি উৎপাদনধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। উদাহরণ হিসেবে, সাবেকি কৃষিব্যবস্থায় লোক কৃষিজমিকে ঘিরেই বসবাস করতো। এই পরিস্থিতিতে যে ধরনের জনজীবন বা সমাজজীবন সম্ভব (যা গ্রামীণ জীবনধারা নামে অভিহিত) তা আধুনিক শিল্প ও কলকারখানা ভিত্তিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার (যেখানে শ্রমিক, যন্ত্রকুশলী ও প্রাশাসকদের প্রয়োজন) সাথে যুক্ত নগরজীবন থেকে ভিন্নধর্মী। এই দিকে থেকে বলা যায়, বিজ্ঞান যখন উৎপাদন-উপকরণগুলোর পরিবর্তনসাধন করে তখন পাশাপাশি তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরও ঘটায়।

দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হ'ল, বিভিন্ন মানবসমাজ নিজেদের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। প্রথম দিকে এই সংঘাত হয়তো ঘটতো উর্বরা জমি, গোচারণক্ষেত্র, বনসম্পদ ও খনিজ সম্পদের দখলদারী নিয়ে। বিগত কয়েক শতাব্দে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে একদেশের দ্বারা আরেকটি দেশকে সম্পূর্ণ দখল করার উদ্দেশ্যে যাতে ঐ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার হস্তশিল্প ইত্যাদি থেকে লাভবান হওয়া যায় এবং যাতে বিজয়ী দেশ তার উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী লাভজনকভাবে অধিকৃত দেশে বিক্রি করতে পারে। এইভাবেই ভারতবর্ষ পরিণত হয়েছিল ব্রিটেনের উপনিবেশে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্র, যা ক্রমাগতই প্রযুক্তিগতভবে উন্নত হতে হবে—তলোয়ার থেকে বন্দুক থেকে মেসিনগান; অথবা সাদামাটা গোলা ছোঁড়ার ব্যবস্থা থেকে কামান বা আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং বোমবর্ষণকারী এরোপ্লেন বা রকেট পর্যন্ত। সর্বশেষ অস্ত্র হলো আণবিক বোমা যার ধাংসাত্মক শক্তি এতই বিশাল যে মাত্র ১০০টি বোমাই বিশ্বের সকল প্রাণীপ্রজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম। এখানেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই আসল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিজ্ঞানে অনগ্রসর কোন দেশকে অন্য দেশের দয়ার উপর নির্ভর করতে, অথবা তাকে অন্য দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে যে দেশ তার উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ, কৃষি, শিল্প ও প্রযুক্তির বিকাশের সাথে যুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের অভাবে দেশের সার্বভৌমিকতা পর্যন্ত বিপন্ন হতে পরে। সমস্ত উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশ আজ এই সঙ্কটের সম্মুখীন।

অনুশীলনী ১

১. প্রাত্যহিক জীবনে বাবহৃত এমন কয়েকটি appliance-য়ের উল্লেখ করুন যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফসল।

.....

.....

.....

.....

.....

২. বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কী ? এই প্রশ্নটি 'বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' শীর্ষক অংশের সঙ্গে যুক্ত।

.....

.....

.....

.....

.....

৩৪.৫ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন জাগে কীভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এত দ্রুত বৃদ্ধি পেল এবং কীভাবে বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ও বাস্তববাদী জ্ঞানের দ্বারা অর্থনীতি, সমাজজীবন এমনকি রাজনীতি এত ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হলো? এর উত্তর নিহিত আছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন ও তার সত্যতা কঠোরভাবে যাচাই করে নেয়ার যেসব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া আছে তার মধ্যে। নীচে এই পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হবে এবং আপনারা দেখবেন যে মূলত তা বেশ সরল, যদিও শুরুতে প্রায় কয়েক শতাব্দ ধরে এই পদ্ধতি প্রচলিত ভিন্ন পদ্ধতিসমূহের সাথে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বে লিপ ছিল।

৩৪.৫.১ বস্তুনিষ্ঠতা

বস্তু, বিষয় ও ঘটনাবলীর সতর্ক পর্যবেক্ষণের উপর এবং যে পরিস্থিতির মধ্যে এই পর্যবেক্ষন চালানো হয় তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার উপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উদাহরণ হিসেবে, গ্রহণক্ষেত্রের গতিবিধি বহুযুগ ধরে বিশ্বের নানাপ্রান্তের লোক পর্যবেক্ষণ করছে; এবং তাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে এইসব গ্রহণক্ষেত্রের গতিবিধি সম্পর্কে এবং তাদের অবস্থান, গতির দ্রুততা এবং তাদের গতিপথের নিয়ম বা অনিয়ম সম্পর্কে হিসেবনিকেশ করা যায়। অন্য এক উদাহরণের কথাও বলা যায়। যখন কেউ অসুস্থ হয়, তখন রোগের সব লক্ষণগুলো ভাল ক'রে লক্ষ্য করা হয়, এবং যদি কোন পথ্য, ঔষধ বা চিকিৎসায় রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করে অথবা অধিকতর অসুস্থ হয় তাও তথ্যাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণকে অতি অবশ্যই পুরোপুরি তর্থনির্ভর হতে হয়, অর্থাৎ যা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে সে বিষয়ে যদি প্রচলিত কোন বিশ্বাস থকে তা যেন পর্যবেক্ষণধারাকে প্রভাবিত না করে। যদি পর্যবেক্ষকেরও কোন ব্যক্তিগত ধারণা বা সংস্কার থাকে তাকেও সরিয়ে রাখতে হবে; এইরকম বস্তুনিষ্ঠতার ফলে পৃথিবীর নানাস্থানে কোন একটি রোগের নানা পর্যবেক্ষক একই জাতীয় সিদ্ধান্তে এসে থাকে। এ থেকে অর্জিত জ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

৩৪.৫.২ পরীক্ষানিরীক্ষা

কখও কখনও এই পর্যবেক্ষণের পরিধি বৃদ্ধি করা সম্ভব একেবারে ঘটনাস্থলে গিয়ে এবং নানা জায়গায় ঘুরে অনুসন্ধান চালিয়ে। যেমন প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবেশে গাছপালারা যেভাবে রয়েছে, অথবা খনিজদ্রব্য মাটির উপরিস্তরে অথবা ভূগর্ভে যেভাবে রয়েছে তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। আবার কখনো কৃত্রিমভাবে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি চারাগাছকে সূর্যালোক থেকে দূরে অন্ধকারের মধ্যে রেখে তার অবস্থা ও আচরণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরীক্ষানিরীক্ষা। আজকের দিনে অবশ্য এমনসব যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে যা মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ আজ আমাদের এমন সব জিনিষ দেখতে সক্ষম করে তুলেছে যা অন্যথায় আমাদের কাছে আদৌ দৃশ্যমান ছিল না বা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্পষ্ট হতো না। পরীক্ষানিরীক্ষা নানাধরণের হতে পারে, যার মধ্যে এক অনন্যসাধারণ পরীক্ষানিরীক্ষা হল মানুষকে রকেটের মধ্যে স্থাপন করে, রকেটের গতিকে হঠাৎই দ্রুত বাড়িয়ে দিয়ে অথবা তাকে পৃথিবীর মহাকর্ষের বাইরে পাঠিয়ে তার আচরণ পর্যবেক্ষণ করা। পরীক্ষানিরীক্ষা, অন্বেষণ ও পর্যালোচনা ইত্যাদির সাহায্যে তথ্য সংগৃহীত হয়—যার কিছু অংশ বর্ণনামূলক হতে পারে, আবার কিছু অংশ পরিমাণগত। এই পরিমাণগত বা পরিমাপযোগ্য তথ্যকে বলা হয় 'data' বা উপাত্ত বা পরিমেয় তথ্য। এই 'data'

সংগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তা হলো তথ্য বিশ্লেষণ (data analysis)। এই পরিমাপযোগ্য তথ্য পরীক্ষা করে দেখা হয়, তার শ্রেণীবদ্ধকরণ করা হয় অথবা রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় অথবা কম্পিউটারে সাজিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবীয় যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। কখনো কখনো এই data-র মাধ্যমে কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ে এবং এর ফলে আরো পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আবার কখনো এই data পূর্বেকার ধারণার বিরোধিতা করে এবং পুরোনো তত্ত্বের পুনর্বিবেচনা করতে অনুপ্রেরণা দেয়। আচরণের সাধারণ সূত্রগুলি থেকে কিছু সিদ্ধান্ত গড়ে তোলা হয় যাকে 'hypothesis' বলা হয়। এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল অসঙ্গতিময় তথ্য বা পর্যালোচনাকে এড়িয়ে না গিয়েও বাস্তবে যা কিছু ঘটছে তা ধরতে পারা।

বৈজ্ঞানিক কাজের ক্ষেত্রে সাধারণত আর এক দফা পযবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষা আছে যার সাহায্যে, কোন সপ্রাণ বা নিষ্প্রাণ বস্তুর আচরণ সম্বন্ধীয় যথার্থ সূত্র গড়ে তোলার আগে, অনুসিদ্ধান্তগুলোকে যাচাই করে নেয়া হয়। আমরা আনুমানিক সূত্রগুলোকে ব্যবহার করি নতুন পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে কিছু পূর্বঘোষণা করতে এবং সেগুলি বাস্তবে ঘটে কিনা তা দেখতে। যদি তা ঘটে তবে সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সূত্রকেও চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে যদি নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ বা পর্যবেক্ষিত তথ্য পাওয়া যায়। অতএব জ্ঞানের বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও পরিশীলন সর্বদাই ঘটতে থাকে।

আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গভীরভাবে বাস্তবতার সাথে, অর্থাৎ বস্তু যা এবং বস্তু যেভাবে আচরণ করে তার সাথে সম্পর্কিত। এই কারণেই এই জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে নতুন সামগ্রী ও নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা যায় — তা সে এরোপ্লেন, সাবমেরিন, জীবনদায়ী ঔষুধ, নতুন ধরনের উদ্ভিদ বা প্রাণী যাই হোক না কেন।

জ্ঞান অর্জনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে অনেকে বিশ্বাস করতো যে জ্ঞান বস্তুত নিজেকে 'প্রকাশ করে', অর্থাৎ জ্ঞান হলো কারোর ভেতর থেকে উঠে আসা ঐক প্রেরণা। আবার অনেকে বিশ্বাস করতেন যে বাস্তব জীবনধারা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়। আবার অনেকে কল্পনা বা অনুমানকে জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেন। অবশ্য, জ্ঞান অর্জন করতে কল্পনা ও অনুমানশক্তি, গভীর চিন্তা ও অনুপ্রেরণা ইত্যাদির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু বিপুল পরিমাণ বাস্তব তথ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ছাড়া কোন নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি হতে পারে না। এবং জ্ঞানের এই নির্ভরযোগ্যতা যাচাই হয় প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

এইমাত্র যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনা আমরা করলাম তা যে কেবলমাত্র বিজ্ঞান ও সমাজে তার প্রয়োগকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তাই নয়, সমাজ বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার অগ্রগতিও এর দ্বারা সাধিত হয়েছে। এমনকি, আমাদের জীবনের সকলক্ষেত্রে প্রতিদিনই আমরা এসব ব্যবহার করি এটা উপলব্ধি না করেই যে আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার করছি। রাস্তায় আমরা ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলি এবং মনে মনে দ্রুত হিসেব করে নিই একটি বিশেষ বেগে বিশেষদিকে রাস্তা পার হতে কতটা সময় লাগতে পারে। আমরা মানুষের আচারব্যবহার লক্ষ্য করি এবং ঠিক করি তার সাথে কী রকম আচরণ করব। আমরা আমাদের চারপাশে যা দেখি তাকে বিশ্লেষণ করি এবং স্বল্পকালীন অথবা দীর্ঘকালীন ভবিষ্যতের কর্মধারা পরিকল্পনা করি। একমাত্র যখন আমাদের হাতে সংবাদ বা তথ্যের খামতি ঘটে তখন কী করা উচিত তা আমাদের অনুমান করে নিতে হয় যাকে অনেকটা বিশ্বাস বা প্রেরণা বলে চিহ্নিত করা যায়। অবশ্য, মানবীয় আচরণ হলো যুক্তিময়তা ও যুক্তিহীনতা, বিবেচনা ও অবিবেচনার এক আশ্চর্য মিশ্রণ। এর কারণ, অধিকাংশ মানুষেরই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট চেতনা না থাকায় তারা

অযৌক্তিক আচরণের সম্ভাবনাকে কমাতে পারে না। তারা তাদের ব্যক্তিগত আচরণকে বিচার করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। এইজন্য মানবীয় আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর — সঙ্গে যুক্ত করে অন্য ধরনের মানসিক গঠন প্রয়োজন।

অনুশীলনী ২

১. প্রাত্যহিক জীবনে এমন কতকগুলি পরিবর্তনের বর্ণনা দিন যা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সাধিত হয়েছে। (৫টি বাক্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

২. প্রাত্যহিক জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনার বর্ণনা দিন যেখানে বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রাধান্য পায়। (৫টি বাক্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

৩৪.৬ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও নেহরু

নির্ভরযোগ্য ও বাস্তব জ্ঞান অর্জনের পেছনে যে মানসিক ধারা তাকে 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' বলেই বর্ণনা করা যায়। ভারতে 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' কথাটি বিশেষ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় বোধহয় এইজন্যে যে আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে এটি ছিল খুব প্রিয়। আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারটা যেন খুব ওপর-ওপর আনুষ্ঠানিক ব্যাপার না হয় সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। প্রাণীবিদ্যা, রসায়ন পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির নানা তথ্য জানলেই যথার্থ বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। তিনি চাইতেন যাতে মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে ওঠে যাতে তারা উৎকৃষ্টতর বিজ্ঞানী, উৎকৃষ্টতর নাগরিক, এবং ব্যক্তিগত চিন্তা ও কর্মধারাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে নেহরুর দেওয়া সভাপতির ভাষণের কিছু অংশ পড়লে আপনারা হয়তো উৎসাহীবোধ করবেন। সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতটি খুবই তাৎপর্যময়।

"এটা রীতিমত দুঃখের যে যখন পৃথিবীতে বিজ্ঞানের এত বিপুল শক্তি বর্তমান যা মানুষের উপকারে লাগে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানকে অকল্পনীয় উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে তখনও লোকে যুদ্ধ ও সংঘাতের কথাই ভাবছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে এমনভাবে বজায় রাখতে চাইছে যার ফলে একচেটিয়া ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে এবং জনগণের বিভিন্ন অংশ ও গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদগত বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। এখানে উপস্থিত নবীন ও প্রবীন আপনাদের সবাইকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এইরকম বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত থেকে চিন্তাভাবনা করতে এবং ৪০ কোটি ভারতবাসীর অবস্থার দ্রুত সমৃদ্ধিসাধনের যুদ্ধে সামিল হতে। আমি নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করি যে বিশ্বের সমস্যাবলী ও আমাদের জাতীয় সমস্যাবলীকে বোঝার একমাত্র সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী হলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও মনোবৃত্তি।

৩৪.৬.১ বৈজ্ঞানিক মানসিকতার ও আবশ্যিক শর্তাবলী

তাহলে কী সেইসব মনের ধারা যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা ও তজ্জনিত বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগের দ্রুতবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়?

এর প্রাথমিক ব্যাপারটি হ'ল মনের সক্রিয়তার এক ধারা যা মানসিক জড়তার বিরোধী। মনের এই সক্রিয়ভাব জন্ম দেয় নিরন্তর কৌতুহলের — এমন এক প্রেরণার যা খুঁজতে ও আবিষ্কার করতে চায়। বিশ্বজগৎ রহস্যে পরিপূর্ণ; এখানে এমন অনেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর পাওয়া যায়নি, এমন অনেক সমস্যা আছে যার সমাধান আজও প্রতীক্ষিত। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে মনের গতি হবে হাল ছেড়ে দেওয়া বা নিষ্ক্রিয়তার পথে নয়, বরং সক্রিয়তা ও আবিষ্কারের অভিযানে সচেষ্ট। প্রাত্যহিক জীবনে এর অর্থ হ'ল, যে যেকাজে নিযুক্ত আছে সেই কাজে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করা এবং তার সাথে যুক্ত নানা প্রশ্নকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিচার করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা।

এই বিষয়টি আর একটি মনোভাবের সাথে জড়িত, এবং তা হ'ল যাচাই না করে কোন সিদ্ধান্ত বা উত্তরকে মেনে না নেওয়া। সাধারণভাবে একটা প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায় যে কোন ধারণা বা মতামতকে সহজেই মেনে নেওয়া হচ্ছে — যেহেতু বহুকাল ধরে সেই ধারণা স্বীকৃত হয়ে আসছে, অথবা মহান কোন ব্যক্তি বা নমস্য কোন গ্রন্থে ঐ মতামত ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্যে প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি ও পরিসংখ্যাগত উপাদান এবং তার উপযুক্ত বিশ্লেষণ। আমরা সবাই এব্যপারে অবহিত যে একশ বছর আগে কিংবা এক হাজার বছর আগে আমরা আজকের তুলনায় কত কম জানতাম। অতএব সেই অতীতের সেই সাবেকি জ্ঞান ঐতিহ্যের ধারা হিসেবে যা আমাদের উপর বর্তেছে তাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া যায় না। অবশ্যই অতীতের অনেক জ্ঞানই যথেষ্ট ভাল যেহেতু তা যথেষ্ট পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাতে এটা বোঝায় না যে সমস্ত সাবেকি ধারনাই যুক্তগ্রাহ্য ও গভীর। তাই প্রচলিত সমস্ত তত্ত্ব ও ব্যাখ্যাসমূহকে বিচার করার ক্ষেত্রে খুঁটিয়ে দেখা ও বাছাই করা দরকার। এটা এক সাধারণ জ্ঞান যে ভিন্ন ভাষার মানুষ, অথবা দেশের ও বিশ্বের নানাপ্রান্তের মানুষ যারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বা জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাদের সম্পর্কে নানা ভ্রান্তধারনা আমরা বংশানুক্রমে নিঃসংশয়ে গ্রহণ ও লালন করি। আমাদের প্রচুর বিশ্বাস ও সংস্কার-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনোভাবের জন্য চাই বস্তুনিষ্ঠতা; প্রচলিত মতামতকে চট্ করে মেনে নেয়ার বদলে ধৈর্য ধরে তা পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করে তবেই নিজস্ব মতামত গড়ে তোলা। এই কারণে বৈজ্ঞানিক মনোভাব সাধারণত অধিক নমনীয় ও খোলামনের ব্যাপার হয়ে থাকে। আপনারা যদি অনুসন্ধিৎসু হন ও প্রশ্ন করতে শেখেন তবে আপনারা অবশ্যই তথ্য ও প্রমাণকে যাচাই করবেন,

ফলে কথনোই গোঁড়ামি বা একপেশে মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতে পারবেন না। তথ্যপ্রমাণের দ্বারা যত নিজেদের মতামতের পরিবর্তন ঘটাতে হয় তত নিজেকে খোলা মনের মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে।

একজন প্রখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী যিনি স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষে বসবাস শুরু করেন এবং এদেশের মানুষের সেবা করতে করতেই এখানে মারা যান — সেই J.B.S. Haldane 'Possible Worlds' নামে একটি বই লেখেন যেখানে তিনি লিখেছেন ঃ

"আমাদের শেখানো হয় যে বিশ্বাস একটি মহৎ গুণ। স্পষ্টতই এটা কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যি কিন্তু আমি মনে করি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা মিথ্যা। আমি এটাও বুঝি যে বর্তমানে মানবজাতির খুব কম সংখ্যক নয়, বরং খুব বেশি সংখ্যকই বিশ্বাস থেকে ভুগছে। ফলে বিশ্বাস নয়, সন্দেহটাই বেশি করে আজ প্রচার করা প্রয়োজন। বিশ্বাস বলতে আমি শুধুমাত্র বা প্রধানত কোন ধর্মে বিশ্বাসের কথাটি এখানে চিন্তা করছি তা নয়, বরং কোন ব্যাপারকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়ার অভ্যাসকেই আমি ইঙ্গিত করছি। আধুনিক বিজ্ঞান সন্দেহের বড় বড় ঘটনা দিয়ে শুরু হয়েছে। সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে — এই ধারণার বিরুদ্ধে কোপারনিকাস সন্দেহ করেছিলেন; ভারী বস্তুপিন্ড হালকা বস্তুপিন্ডের চাইতে দ্রুততর গতিতে নীচে পড়ে — এই ধারণার বিরুদ্ধে গ্যালিলেও সন্দেহ শুরু করেন; রক্তপ্রবাহ শিরার মধ্য দিয়ে 'কলা'য় (Tissue) যায় — এই ধারণার বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন হার্ভে।"

সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা থেকে যেন রহস্য ও নিষ্ক্রিয়তা জন্ম না নেয়, বরং সাক্ষ্যপ্রমাণ, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্যে আরো সক্রিয়তা সৃষ্টি হয় যাতে আরো নির্ভরযোগ্য মতামত ও অনুসিদ্ধান্ত গড়ে তোলা যায়। বিশ্লেষণও একটি যুক্তিবাদী প্রক্রিয়া। তথ্যগুলোকে যাচাই করার সময় যুক্তি প্রায়োগ করা হয় এবং তার দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এর জন্যে প্রথম প্রয়োজন হলো সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে যথেষ্ট মাত্রায় পরিসংখ্যান ও তথ্য। এটা যেন এমন না হয় যে "একজন ইংরেজ একজন ভারতীয়কে লন্ডনের রাস্তায় থুথু ফেলতে দেখলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে সব ভারতীয়রাই নোংরা স্বভাবের"। বস্তুত আমরা বহুক্ষেত্রেই এই ধরনের ভ্রান্ত সরলীকরণ করি এবং নানা সংখ্যালঘু জাতি বা গোষ্ঠীর লোকেদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও সামাজিক আচরণ সম্পর্কে স্বল্প সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে নানা ধারণা তৈরি করে বসি। শিখ, গোর্খা, মুসলিম অথবা পার্সি প্রভৃতি গোষ্ঠী সম্পর্কে আমাদের বহু ধারণার সৃষ্টি এইভাবেই।

যুক্তির যথাযত প্রয়োগের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে তাকে গ্রহণ করার মত মানসিক প্রস্তুতি আমাদের থাকা উচিত, এমনকি যদি সেই সিদ্ধান্ত আমাদের নিজের প্রিয় কোন ধারণা অথবা ব্যাপক জনগণের মধ্যে প্রচলিত কোন ধারণার বিরুদ্ধে যায়ও। অন্যভাবে বলা যায়, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ধারণাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন সংস্কার থাকা অথবা তাকে এড়িয়ে চলা উচিত নয়। গোঁড়ামি বর্জন ও খোলা মন এই দুটি হলো বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে, আমরা জানি যে পৃথিবী ব্যাপক বৈচিত্রে পূর্ণ এবং আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি যখন অনেক কিছুই স্পষ্টভাবে জানা বা বোঝা যাচ্ছে না, তাই বৈজ্ঞানিক মনোভাবের একটা দিক হলো কোন মতামত পোষণ বা ব্যক্ত করার ব্যাপারে ঔদ্ধত্যের বদলে বিনয় দেখানো। অনেককিছু সম্পর্কেই আমরা পুরোপুরি দৃঢ়নিশ্চিত হতে পারি না, এবং তাই কোন ধারণা পোষণ করার ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি থাকাটাও উচিত নয়; বরং কোন কিছু সম্পর্কে নিজের ধারণার পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে প্রস্তুত থাকা উচিত। অন্যদিকে, বিগত শতাব্দগুলিতে মানুষের অর্জিত কৃতিত্ব আমাদের মনে বিজ্ঞানের ক্ষমতা সম্পর্কে এই আস্থা সৃষ্টি করেছে যে বিজ্ঞান অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে পারে এবং আজকের অসমাধিত সমস্যাবলীর সমাধান হয়তো কাল সমাধান করবে। এই অর্থে কোন কিছুই আমাদের ক্ষমতার অতীত নয়। মানবীয় প্রয়াসের উপর আস্থাই হলো আবিষ্কার, অনুসন্ধান ও সৃজনমূলক সক্রিয়তার ভিত্তি। এর সাথে 'ভবিতব্যবাদে'র কোন যোগই নেই — যে ভবিতব্যবাদ মনে করে যে মানুষের জীবন তার নিজের নিয়ন্ত্রণে নয়, ববং তা নিয়ন্ত্রিত হয় ভাগ্য বিধাতরা হাতে ক্রীড়নক হিসেবে। উপরোক্ত এইসব বৈশিষ্ট্যই হলো বৈজ্ঞানিক মনোভাবের চারিত্রলক্ষণ। অবশ্য এর সাথে রয়েছে কঠোর ধারাবাহিক কর্মোদ্যোগ এবং আচরণ ও কর্মের মধ্যে সঙ্গতি।

বর্তমান একক-টির পরিসমাপ্তিতে নেহরুর অপর একটি জোরালো উদ্ধৃতি উল্লেখ করা সমীচীন হবে। উদ্ধৃতিটি তাঁর 'Discovery of India' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ঃ

"আজকের প্রতিটি দেশ ও জাতির উন্নয়নের পক্ষে বিজ্ঞানের প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রায়োগের চাইতে অতিরিক্ত কিছুও প্রয়োজন। এবং তা হলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিজ্ঞান সম্পর্কে দুঃসাহসিক অথচ সমালোচনাপূর্ণ মনোভাব, সভ্য ও নতুন জ্ঞানের অন্বেষণ, কোন কিছুর পরীক্ষা বা যাচাই করা ছাড়া গ্রহণ না করা, নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণের আলোয় পুরোনো সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করে নেয়ার মানসিকতা, পূর্বানুমানভিত্তিক তত্ত্বের উপর নয় বরং পর্যবেক্ষণভিত্তিক তথ্যের উপর আস্থা, এবং মনের কঠোর শৃঙ্খলা — এসবই প্রয়োজন শুধু বৈজ্ঞানিক প্রায়োগের জন্য নয়, বরং জীবন ও তার নানা সমস্যার সমাধানের জন্য।"

অনুশীলনী ৩

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কাকে বলে?

.....

.....

.....

.....

.....

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বিষয়ে নেহরুর মতামত কয়েকটি বাক্যে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা জন্য কী কী গুণাবলীর প্রয়োজন বলে মনে করেন?

.....

.....

.....

.....

.....

৩৪.৭ সারাংশ

এই একক পাঠে আমরা এখন বুঝতে পেরেছি বৈজ্ঞানিক মানসকতা কাকে বলে, এবং আমাদের দেশে প্রতিটি মানুষের জীবনে কেন ঐ মানসিকতা এত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি যে বিজ্ঞান আমাদের জীবনকে সম্ভাব্য প্রায় সকল দিক থেকে বদলে দিয়েছে, অথচ আমাদের অনেক ধ্যানধারণাই অবৈক্ষানিক বা প্রাক্-বৈজ্ঞানিক। এই অবৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানবিরোধী মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণাই অধিকাংশ সময় আমাদের ভয়ঙ্কর নেতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন ও প্রক্রিয়াসমূহের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে — যেমন সাম্প্রদায়িক বা প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী সমূহ। এগুলিকে মাথায় রেখেই পন্ডিত নেহরু প্রমুখ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতারা বৈজ্ঞানিক মানসিকতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

৩৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

Bernal J.D. 1968 The Social Function of Science MII Press

David Benj. 1973 The Scientists Role in Society Prentice Hall

Haldane JBS 1958 The Utility and Discovery of Life 'Ministry of Information of Broadcasting, Govt. of India', Publication Division

Malhotra P. (2nd ed) 1984 Nehru : An Anthology for Young Readers, New Delhi, NCERT.

Narasimhaiah, H. 1987 : Science, Nonscience and the Paranormal, Bangalore Science Forum, Bangalore.

Ravety, J.R. 1973 Scientific Knowledge and its Social Problems, London Penguin.

UNESCO, 1971 An Esay on the Origin and Organisation of National Science Policies. Pt. I.

৩৪.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১. বৈদ্যুতিক আলো, রেকর্ড, টেপ, রেডিও, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য যন্ত্রসামগ্রী হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফসল।

২. ৩৪.৪.৩ Sectionটি দেখুন।

অনুশীলনী ২

১. বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে আমাদের জ্ঞানের বিপুল বিস্তার ঘটেছে। এছাড়াও এর ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলার মাত্রা এবং নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। আরো বাস্তব স্তরে বিজ্ঞানের অবদান

আছে যেমন আমাদের আয়ুকে দীর্ঘতর করেছে। নেতিবাচক পরিবর্তনও আছে যেমন পরিবেশের দূষণ ইত্যাদি।

২. বিভিন্ন ধরনের আচার অনুষ্ঠানাদি এবং অতিরিন্দ্রিয়বাদ ও আদিযাদুবিদ্যায় বিশ্বাস ইত্যাদিকে অবৈজ্ঞানিক চিন্তার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যায় যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে।

অনুশীলনী ৩

১. জীবন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করা মনের এক দিশা।

২. নেহরু ছিলেন তাঁর দেশের নরনারীর মানসিক গঠনে আচার সর্বস্বতা ও নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে। তিনি মনের সক্রিয়তা ও গতিময়তার উপর জোর দিতেন।

৩. অনুসন্ধিৎসা, মনের স্বাধীন ঝোঁক, ব্যক্তিগত বিশ্বাসমূহের উপরে ওঠার ক্ষমতা ইত্যাদি।

—০—